অগ্রগতির পথে ত্রিপুরা

(১৯৭২ - ২০১২)

ত্রিপুরা সরকার

सत्यमेव जयते

মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে

মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে

'কথায় নয়, কাজের মাধ্যমেই আসল পরিচয়।'

প্রকৃতপক্ষে কথা ও ভাষণ দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কাজ করা। এই নীতিতে বিশ্বাস ও আশ্বাস রেখেই বিগত বছরগুলোতে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ভারত সরকার অনুসৃত নব উদারনীতির কারণে যেখানে শুধু ধনী এবং ক্ষমতাবানরাই উপকৃত হয়, সেখানে তার বিপরীতে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে 'দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম' মানুষের উন্নয়ন। এই পুরো উন্নয়ন প্রক্রিয়াতেই সমস্ত ত্রিপুরাবাসী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছেন।

১৯৭২ সালে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যা যা উন্নয়ন ঘটেছে তার কিছু কিছু চিত্র উপস্থাপনার একটি বিনীত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই পুস্তিকায়।

বস্তুতপক্ষে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে আমাদের এই যাত্রা সবে শুরু হয়েছে, এখনও অনেক পথ যেতে হবে। লক্ষ্য পূরণের পথে আমাদের প্রচেষ্টায় সহায়ক যে কোনো গঠনমূলক সমালোচনা, উপদেশ কিংবা প্রস্তাব আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

(মানিক সরকার)

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা ৩-৫

রাজ্যের পরিলেখ

১.১ ভূমি ৬-৭
১.২ জনগণ ৮
১.৩ অর্থনীতি ৯
১.৪ প্রশাসনিক কাঠামো ১০

পরিকাঠামো উন্নয়ন

২.১ সড়ক যোগাযোগ / সড়ক পরিবহন ১১-১৩
২.২ সরকারি ভবন ১৪
২.৩ রেল যোগাযোগ ১৪-১৫
২.৪ বিমান যোগাযোগ ১৫
২.৫ বিদ্যুৎ ১৬-১৭
২.৬ টেলি যোগাযোগ ও আই টি ১৮-১৯

মানব সম্পদ উন্নয়ন

৩.১ বিদ্যালয় শিক্ষা ২০-২২
৩.২ উচ্চ শিক্ষা ২৩-২৫
৩.৩ সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা ২৫-২৮
৩.৪ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ২৯-৩১

রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

৪.১ কৃষি ৩২-৩৫
৪.২ উদ্যান চাষ ৩৬-৩৮
৪.৩ প্রাণী সম্পদ বিকাশ ৩৯-৪০
৪.৪ মৎস্য ৪১-৪৩
৪.৫ বন ৪৪-৪৬
৪.৬ শিল্প ও বাণিজ্য ৪৭-৪৮
৪.৭ পর্যটন ৪৯-৫১

মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান

৫.১ ভূমিহীন / গৃহহীন লোকদের সরকারী জমি বন্দোবস্ত দেওয়া ৫২-৫৩
৫.২ আবাসন ৫৩
৫.৩ পানীয় জল সরবরাহ ৫৩-৫৪
৫.৪ স্বাস্থ্যবিধি ৫৫

সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ

৬.১ উপজাতি কল্যাণ ৫৬-৫৮
৬.২ এস সি এবং ও বি সি কল্যাণ ৫৮-৬১
৬.৩ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কল্যাণ ৬২-৬৩

অগ্রগতির দিশা ৬৪

(NOT TO SCALE)

প্রস্তাবনা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমতম কোনায় অবস্থিত ত্রিপুরা ১৯৭২ সালে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। দেশ বিভাগের সবচেয়ে বড় শিকার হয় ত্রিপুরা। এই বিভাগের ফলে ত্রিপুরার মূল ভূখণ্ডের সাথে যে চিরাচরিত সংযোগ ছিল তা ছিন্ন হয়ে যায়। অনুন্নত পরিকাঠামো সম্পন্ন ভৌগোলিকভাবে একটি বিচ্ছিন্ন রাজ্যে পরিণত হয় ত্রিপুরা। রাজ্যের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। তাই রাজ্যের নিজস্ব আর্থিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কিছু করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মৌলিক পরিকাঠামো গড়ে না ওঠার কারণে রাজ্যের শিল্পায়নও ব্যাহত হয়েছে।

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে পা বাড়িয়েছে। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকার যে কৌশলটি অবলম্বন করেছে তার মূলে রয়েছে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে জনসম্পদকে কাজে লাগানো এবং ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালে সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। মানব সম্পদ ও মৌলিক কাঠামোগত পরিকাঠামোর উন্নয়নকে উন্নয়নের পথে অন্যতম সিঁড়ি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। শান্তিপ্রিয় জনগণের সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ঘনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে রাজ্য সরকার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে প্রতিহত করে আইন ও শৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছে এবং তা উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচীকে রূপায়ণ করতে সাহায্য করেছে।

১৯৭২ সালে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভের পর থেকে রাজ্য বহুদূর এগিয়ে এসেছে। মানব সম্পদ পরিকাঠামো কিংবা আর্থিক উন্নয়নই হোক না কেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগ সব ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এসেছে। ত্রিপুরার দক্ষিণতম অংশ অর্থাৎ সাব্রুম পর্যন্ত জাতীয় সড়ক সম্প্রসারিত হয়েছে। রাজ্যের ৮০ শতাংশের বেশি বসতিকে সর্ব ঋতু-উপযোগী রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। আগরতলা পর্যন্ত

রেলপথ এসেছে এবং সাব্রুম পর্যন্তও তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনেরও প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আগরতলাই হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমান বন্দর। এখানে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১৭৬টি ফ্লাইট উঠা-নামা করছে। পালাটানার ৭২৬.৬ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্পটি চালু হওয়ার সাথে সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত হবে। ও এন জি সি, রাজ্য সরকার এবং আই এল এন্ড এফ এস- এর যৌথ উদ্যোগ ও পি টি সি (ও এন জি সি, ত্রিপুরা পাওয়ার কর্পোরেশন) পালাটানার এই প্রকল্পটি স্থাপনের দায়িত্বে রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তির (আই সি টি) যে পরিকাঠামো রয়েছে তা দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়।

রাজ্য সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাজ্য তার সুফলও পেতে শুরু করেছে। ২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী সারা দেশের সাক্ষরতার হারে ত্রিপুরার স্থান চতুর্থ অর্থাৎ কেরালা, মিজোরাম এবং লাক্ষাদ্বীপের পরই ত্রিপুরার স্থান। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও জাতীয় গড় -এর নিরিখে ত্রিপুরার অবস্থান ভালো।

পরম্পরাগতভাবেই ত্রিপুরা কৃষি নির্ভর রাজ্য এবং বর্তমানেও তাই রয়েছে। ত্রিপুরার খাদ্য শস্য উৎপাদনে ১৯৭২ সালের ২.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২০১২ সালে দাঁড়িয়েছে ৭.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। এটা সম্ভব হয়েছে মূলত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে। মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রেও রাজ্য বর্তমানে স্বয়ম্ভর। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দশগুণ। ১৯৭২ সালে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৬৮৬ মেট্রিক টন, তা বেড়ে ২০১২ সালে দাঁড়িয়েছে ৫৩,০৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যখন উন্নতি বেড়ে চলেছে তখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও উন্নতি পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছে। রাজ্যের মোট ঘরোয়া উৎপাদনে (জি এস ডি পি) দ্বিতীয় ক্ষেত্রের যোগদান ১৯৯৮ সালে ছিল ১৪.১ শতাংশ। তা বেড়ে ২০১০ সালে দাঁড়িয়েছে ২৬.৪ শতাংশ। আগরতলার কাছে ৭০০ একর-এরও বেশি এলাকাজুড়ে বোধজংনগর

ত্রিপুরার মূল শিল্প ক্ষেত্র (ফ্ল্যাগশীপ ইন্ডাস্ট্রীয়্যাল ক্লাস্টার) হিসেবে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন এর সূত্রপাত হয় মাত্র ১৯৯৫ সালে। এর মধ্যেই এই বাণিজ্যের পরিমাণ বছরে প্রায় ৩৩০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

রাজ্য সরকার জনগণের জন্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে যাতে তাঁরা সম্মানের সাথে জীবন নির্বাহ করতে পারে এবং জীবনে উন্নতি করতে পারে। রাজ্য সরকার ভূমিহীন ও গৃহহীন লোকেদের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিয়ে আসছে এবং গৃহ নির্মাণ করে দিচ্ছে। ২০১২ পর্যন্ত রাজ্য সরকার প্রায় ১.৮৬ লক্ষ পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দিয়েছে এবং ইন্দিরা আবাস যোজনায় প্রায় ২.০৬ লক্ষ পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছে। রাজ্য সরকার সবার জন্য নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় পানীয় জলের বন্দোবস্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে এবং স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপারে ১০০ শতাংশ সাফল্যের উদ্দেশ্যে কাজ করছে।

সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষের উন্নতির জন্য সরকার বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। তাঁদের শিক্ষাগত ও আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। উপজাতি ও অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসীদের (বনাধিকার স্বীকৃতি) আইন, ২০০৬ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রাজ্যের উপজাতি উন্নয়নে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলির উন্নয়নে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ কর্ম পরিকল্পনা (অ্যাকশন প্ল্যান) গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকার স্বচ্ছ ও জনদরদী শাসনব্যবস্থা প্রদানের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে, যেখানে দুর্নীতি ও নীতি বর্হিভূত পন্থার কোনো স্থান নেই।

জনসাধারণের তথা শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থে গ্রন্থিত এই সংকলনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে লব্ধিত অগ্রগতির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা।

রাজ্যের পরিলেখ

ভূমি

একদা রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে একটি 'গ' শ্রেণীর রাজ্য হিসেবে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে। ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই তারিখে এটি একটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয় এবং ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারি ত্রিপুরা একটি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

নিরক্ষরেখা থেকে রাজ্যের দূরত্ব হচ্ছে ২২°৫৬ ডিগ্রি এবং ২৪°৩২ ডিগ্রি উত্তরে এবং দ্রাঘিমারেখার নিরিখে তার অবস্থান ৯১°০৯ ডিগ্রি এবং ৯২°২০ ডিগ্রি পূর্বে। রাজ্যের মোট ভৌগোলিক আয়তন হচ্ছে ১০,৪৯১.৬৯ বর্গ কি.মি.। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূমি পরিবেষ্টিত রাজ্য ত্রিপুরার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রয়েছে বাংলাদেশ। এর সাথে বাংলাদেশের ৮৫৬ কি.মি. দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে অর্থাৎ যা হচ্ছে রাজ্যের মোট সীমানার ৮৪ শতাংশ। আসাম ও মিজোরামের সাথেও রাজ্যের যথাক্রমে ৫৩ কি. মি. এবং ১০৯ কি.মি. সীমানা রয়েছে।

ইন্দো-মালয়ান ও ইন্দো-চীন সাব রিজিওনে যে ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদকুল বিদ্যমান তার সাথে ত্রিপুরার প্রাণী-উদ্ভিদকুলেরও যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এখানে রয়েছে ৩৭৯ জাতের গাছ, ৩২০ রকমের গুল্ম জাতীয় বৃক্ষ, ৫৮১ প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ, ১৬৫ জাতীয় লতা, ১৬ ধরনের লতানো গুল্ম, ৩৫ প্রকারের পর্ণাঙ্গ, ৪৫ প্রকার এপিফাইট্স্ এবং ৪ প্রকার পরজীবী উদ্ভিদ; তাছাড়া আছে ১৮ প্রকার দুর্লভ গাছপালা। রাজ্যে রয়েছে ২৬৬ প্রজাতির ঔষধি গাছপালা (তার মধ্যে ৬৮ রকম গাছ, ৩৯ প্রকার গুল্ম, ৭১ প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ এবং ৮৮ প্রকার লতা)। মূল্যবান বন উৎপাদের মধ্যে রয়েছে শাল, সেগুন, গামাই, গর্জন ও চম্পা। রাজ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ বাঁশ।

ত্রিপুরায় ৯০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর বাস এবং জলের নীচে রয়েছে ৪৭ প্রজাতির মৎস্যকুল। তারপর ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস।

ত্রিপুরার অন্যতম পাহাড়গুলির মধ্যে রয়েছে জম্পুই, সাখানটাং, লংতরাই, আঠারমুড়া, বড়মুড়া, দেবতামুড়া, বেলখুম ও কালাঝারি। জম্পুই পাহাড়ের বেতলিং শিব (৯৩৯ মিটার) হচ্ছে ত্রিপুরার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ত্রিপুরায় রয়েছে বহু বৃষ্টি নির্ভর ঋতুজীবী নদী ও ছড়া যেগুলি বাংলাদেশের অভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে। মুখ্য নদ-নদীগুলি হচ্ছে গোমতী, হাওড়া, মনু, ধলাই, মুহুরী, ফেনী এবং জুরি যেগুলি বর্ষার সময় ফুলে ওঠে এবং বছরের বাকি সময়ে জলের পরিমাণ কম থাকে।

ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরাই হচ্ছে ক্ষুদ্রতম রাজ্য (সিকিমকে বাদ দিয়ে) যার প্রায় ৬০ শতাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে বন অর্থাৎ মাত্র ২৭ শতাংশ এলাকা পাওয়া যাচ্ছে চাষ করার জন্য। রাজ্যের বৃষ্টিপাতের হার বেশ ভালো — সারা বছর জুড়ে প্রায় ২১০ সেমি. বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এখানে।

জনগণ

২০১১ সালের জনগণনার প্রাথমিক(প্রভিশনাল) হিসাব অনুযায়ী ত্রিপুরার জনসংখ্যা ৩৬,৭১,০৩২ জন এবং তার মধ্যে পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা যথাক্রমে ১৮,৭১,৮৬৭ এবং ১৭,৯৯,১৬৫ জন। লিঙ্গ অনুপাত (সেক্স রেশিও) ২০০১ সালের ৯৪৮ থেকে বেড়ে ২০১১ সালে হয়েছে ৯৬১ যা জাতীয় গড় -এর তুলনায় বেশি। ২০১১ সালে প্রাপ্ত জাতীয় গড় হচ্ছে ৯৪০ জন। স্বাস্থ্য সূচক-এও ত্রিপুরার হার জাতীয় হার-এর তুলনায় ভালো। যথাযথভাবেই ২০১০ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতি হাজারে ত্রিপুরার জন্ম হার ছিল ১৪.৯ এবং মৃত্যু হার ৫.০, এবং শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ২৭.০; যেখানে জাতীয় গড় হচ্ছে যথাক্রমে ২২.১, ৭.২ এবং ৪৭.০।

ত্রিপুরার সাক্ষরতার হারও জাতীয় গড় -এর চেয়ে বেশি। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ত্রিপুরার সাক্ষরতার হার ২০০১-এর ৭৩.১৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১১ সালে দাঁড়িয়েছে ৮৭.৭৫ শতাংশ। ২০১১ সালে জাতীয় সাক্ষরতার হার হচ্ছে ৭৪.০৪ শতাংশ। স্বভাবতই, সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় স্তরে ত্রিপুরার স্থান এখন চতুর্থ, অর্থাৎ কেরালা, মিজোরাম এবং লাক্ষাদ্বীপ-এর পরে।

ত্রিপুরার জনসংখ্যায় সামাজিক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৩১ শতাংশ হচ্ছে উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক। এখানে ১৯টি উপজাতি জনগোষ্ঠীর বসবাস যাদের নিজ নিজ সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে। জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ হচ্ছে তপশিলী জাতির লোক। তাছাড়া বাকি জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ হচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু শ্রেণীর মানুষ যার মধ্যে রয়েছে মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন। ২০১১-এর জনগণনার হিসেবে ত্রিপুরার জনসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৫০ জন যা জাতীয় গড় ৩৮২-র তুলনায় কম। তথাপি, যেহেতু রাজ্যের মোট ৬০ শতাংশ এলাকা বন ও পাহাড় আচ্ছাদিত এবং খুব কম সংখ্যাক লোকের বাস এতে, তাই বাকি এলাকার উপর বেশ চাপ রয়েছে। ১৯৫১ সাল থেকে ত্রিপুরার জনসংখ্যাগত বিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে নীচে :

বিবরণ	১৯৫১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
জনসংখ্যা (লক্ষ হিসেবে)	৬.৪৬	১৫.৫৬	২০.৫৩	২৭.৫৭	৩১.৯৯	৩৬.৭১
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.-তে)	৬২	১৪৮	১৯৬	২৬৩	৩০৫	৩৫০
উপজাতি (লক্ষ হিসেবে)	২.৩৭	৪.৫১	৫.৮৪	৮.৫৩	৯.৯৩	এন আর*
তপশিলী জাতি (লক্ষ হিসেবে)	০.৪০	১.৯৩	৩.১০	৪.৫১	৫.৫৬	এন আর*

* জনগণনার ২০১১ তথ্য প্রকাশিত হয়নি

অর্থনীতি

ত্রিপুরার অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। প্রায় অর্ধেক লোক জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। তথাপি ত্রিপুরার জি এস ডি পি-তে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের যোগদান ছিল মাত্র ২২ শতাংশের কাছাকাছি (২০১০) এবং এই হার প্রতি বছর নিম্নমুখী হয়ে যাচ্ছে। আবার, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এর যোগদান ক্রমশ বেড়ে চলেছে যা নীচের টেবিলে দৃশ্যমান :

ক্ষেত্র	১৯৯৮ (%)	২০১০ (%)
প্রাথমিক ক্ষেত্র	৩১.০৯	২২.০০
দ্বিতীয় ক্ষেত্র	১৪.১১	২৬.৩৯
তৃতীয় ক্ষেত্র	৫৪.৭৯	৫১.৬১

ত্রিপুরায় মাথাপিছু আয় বাড়ছে। কিন্তু তথাপি তা এখনো জাতীয় গড় -এর তুলনায় কম। নীচের টেবিলে তা তুলে ধরা হয়েছে :

বছর	২০০৪-০৫ কে ভিত্তি বছর ধরে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয়	
	ত্রিপুরা	সর্বভারতীয়
২০০৪-০৫	২৪,৩৯৪	২৪,০৯৫
২০০৫-০৬	২৬,৬৬৮	২৭,১৮৩
২০০৬-০৭	২৯,০৮১	৩১,০৮০
২০০৭-০৮	৩১,১১১	৩৫,৪৩০
২০০৮-০৯	৩৫,৩৫০	৪০,১৪১
২০০৯-১০(পি)	৩৯,৯৪৯	৪৬,১১৭
২০১০-১১(এ)	৪৪,৯৬৫	৫৩,৩৩১
২০১১-১২(কিউ)	৫০,৭৫০	৬০,৯৭২

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ত্রিপুরার মাথাপিছু আয় জাত্রিয় গড়-এর তুলনায় জোরকদমে বেড়ে চলেছে যা খুবই উৎসাহজনক। নীচের টেবিলে তা পরিলক্ষিত হচ্ছে :

বছর	২০০৪-০৫ কে ভিত্তি বছর ধরে মাথাপিছু আয়- এর বাৎসরিক বৃদ্ধির হার (%)	
	ত্রিপুরা	সর্বভারতীয়
২০০৫-০৬	৬.৬	৯.৬
২০০৬-০৭	৭.৬	৯.৮
২০০৭-০৮	৭.৩	৯.১
২০০৮-০৯	৭.০৬	৬.৪
২০০৯-১০ (পি)	৮.৪	৮.০
২০১০-১১ (এ)	৮.৬	৮.৪
২০১১-১২ (কিউ)	৮.৬	৬.৯

প্রশাসনিক কাঠামো

চারটি নতুন জেলা, ৬টি নতুন মহকুমা এবং ৫টি নতুন ব্লক সৃষ্টি করে সরকার তার প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করেছে। ২০১২ সালের ২১শে জানুয়ারি থেকে এই নতুন প্রশাসনিক ইউনিটগুলি কাজ করতে শুরু করেছে। জনগণকে আরো বেশি ভালো পরিষেবা প্রদান এবং উন্নয়ন কর্মসূচীর সঠিক রূপায়ণের উদ্দেশ্যেই সরকার তার প্রশাসনিক কাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েছে। এই পুনর্বিন্যাসের ফলে এখন রাজ্যে রয়েছে ৮টি জেলা, ২৩টি মহকুমা, ৪৫টি ব্লক এবং একটি ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ। ১৯৮২ সালে সংবিধানের ৭ম তপশিল অনুসারে এই জেলা পরিষদ গঠন করা হয় এবং ১৯৮৫ সালে তা ষষ্ঠ তপশিল এর আওতায় আনা হয়। ১৯৭২ সালে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করার পর থেকে রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর কীভাবে বিবর্তন ঘটেছে তা নীচের টেবিলে তুলে ধরা হল :

প্রশাসনিক ইউনিট	ইউনিট	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
জেলা	সংখ্যা	৩	৩	৪	৮
মহকুমা	”	১০	১০	১৫	২৩
ব্লক	”	১৭	১৭	২৯	৪৫
রেভিনিউ সার্কল	”	১৭	১৭	৩১	৩২
রেভিনিউ ভিলেজ	”	৮৭১	৮৭১	৮৭৪	৮৮৬
তহশিল অফিস	”	১৭৭	১৭৭	১৮২	১৮৭
ত্রিপুরা উপজাতি জেলা পরিষদ	”	-	-	১	১
জেলা পরিষদের জোনাল অফিস	”	-	-	৪	৪
সাব জোনাল অফিস	”	-	-	২৭	৩২
গ্রাম পঞ্চায়েত	”	৪৭৬	৬৮৯	৫৩০	৫১১
জেলা পরিষদের ভিলেজ কমিটি	”	-	-	৪৩২	৫২৭
নগর পঞ্চায়েত	”	৯	৯	৯	১৫
আগরতলা পুর পরিষদ	”	১	১	১	১
থানা	”	২৪	৩২	৪৩	৬৪

রাজ্যের তথা রাজ্যবাসীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারকে দিনদিন আরো বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। ফলে বছর বছর কর্মচারীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। নীচের চিত্রে তা-ই তুলে ধরা হয়েছে :

১৯৭৭	১৯৭৯	১৯৮১	৩১.১২.২০১১ তারিখ পর্যন্ত
৫৭,৪৮৭	৪৬,৪৩২	৯১,৪৮৬	১,৬৩,৮০৫

৩১.১২.২০১১ তারিখের হিসেবে দেখা গেছে রাজ্যে মোট ১,৬৩,৮০৫ জন কর্মচারী রয়েছেন। তারমধ্যে ১,০৮,০০০ জন হচ্ছেন রেগুলার স্কেলে কর্মরত, ৫৫,৫২৩ জন হচ্ছেন ফিক্সড পে / ডি আর ডব্লিউ / কন্টিনজেন্ট / পি টি ডব্লিউ/ স্কীম ওয়ার্কার ইত্যাদি এবং ১১,২৮২ জন হচ্ছেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত।

পরিকাঠামো উন্নয়ন

সড়ক যোগাযোগ / সড়ক পরিবহন

রাজ্য সরকারের একটি বিশেষ লক্ষ্য হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত বসতিগুলিকে সর্ব-ঋতু উপযোগী সড়ক দ্বারা সংযুক্ত করা। বিগত বছরগুলিতে রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। ১৯৪৯ সালে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানকালে রাজ্যে মাত্র ৫০ কি.মি.-এর মতো রাস্তা ছিল। বর্তমানে তা প্রসারিত হয়ে প্রায় ১৮,৩৬২ কি.মি.-তে দাঁড়িয়েছে। যে সমস্ত বসতিগুলিতে রাস্তাঘাট নেই সেগুলিকেও সংযুক্ত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা (পি এম জি এস ওয়াই) প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ২০৪৯ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। কাঠের সেতুগুলির জায়গায় পাকা বা স্থায়ী সেতু নির্মাণের ফলেও রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। ১৯৭২ সাল থেকে যে

পরিমাণ উন্নতি হয়েছে তার সূচকগুলি নীচে দেওয়া হল :

ক্রমিক নং	বিষয়	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	জাতীয় সড়ক (কি.মি.)	১৯৮	প্রযোজ্য নয়	৩৩৩	৪৪৮
২.	রাজ্য সড়ক (কি.মি.)	১৩০	”	প্রযোজ্য নয়	৬৮৯
৩.	বড় বড় জেলা সড়ক (কি.মি.)	প্রযোজ্য নয়	”	৪৫৫	৯০*
৪.	অন্যান্য জেলা সড়ক (কি.মি.)	”	”	১৫৪৩	১২১৮*
৫.	গ্রামীণ সড়ক (কি.মি.)	”	”	৪৩৯৭	৭২৭৯
৬.	আর সি সি সেতু (সংখ্যা)	”	”	২২	৯৭
৭.	বেইলী ব্রিজ (সংখ্যা)	”	”	৭৮	৩৬৯

* ১৯৯৮ -এর নিরিখে ২০১২ -এ জেলা সড়কের দৈর্ঘ্য কমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে বহু জেলা সড়ককে রাজ্য সড়কে উন্নীত করা হয়েছে।

২০০৪ -এর জনগণনা অনুযায়ী রাজ্যে মোট ৮,১৩২টি বসতি রয়েছে। তার মধ্যে ইতিমধ্যে ৬৫৭২ টি বাসস্থানকে সর্ব-ঋতু উপযোগী রাস্তার মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে। ১৯৭২ থেকে এই ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে তা নীচের টেবিলে রয়েছে :

বিষয়	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১১	২০১২
সর্ব-ঋতু উপযোগী রাস্তার মাধ্যমে সংযুক্ত বসতি সংখ্যা	৩৮৩১	৩৯৯৫	৫৪৩৭	৬০৯৫	৬৫৭২

সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে রাস্তায় ট্রাফিকের (গাড়ির সংখ্যা) সংখ্যাও দ্রুত বেড়ে চলেছে। বিগত ১২ বছরে নথীভুক্ত যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে চার গুণ। এই ক্রমবর্ধমান যানবাহনের মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। চন্দ্রপুরে ইন্টার-স্টেট বাস টার্মিনাস (আই এস বি টি), আগরতলার রাধানগরে আধুনিক মোটরস্ট্যান্ড ও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২৪টি মোটর স্ট্যান্ড নির্মাণের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো হয়েছে। আরো ১৬টি নতুন মোটর

স্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি ৩৮টি বাস (৩০টি সি এন জি সহ) নামিয়ে সিটি বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। আরো ১৫টি বাস শীঘ্রই এই পরিষেবায় যোগ দেবে এবং আরো ২২টি নতুন বাস ক্রয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই বাসগুলি দিয়ে উক্ত পরিষেবাটিকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করার জন্য ত্রিপুরা আরবান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী গঠন করা হয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে এক্ষেত্রে লব্ধ প্রগতির কিছু সূচক নীচে তুলে ধরা হল :

ক্রমিক নং	বিষয়	ইউনিট	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	**সড়ক যোগাযোগ**					
	i) আই এস বি টি সহ	টার্মিনাস	-	-	-	৫ (নির্মীয়মাণ ১টি সহ)
	ii) ট্রাক টার্মিনাস	”	-	-	-	১টি (নির্মীয়মাণ)
	iii) মোটর স্ট্যাণ্ড	”	-	-	-	২৪
২.	**বেসরকারী যানবাহন**					
	i) হাল্কা	”	১৬৮৫	২২১০	৬২৮৩	৩৮১২৯
	ii) দ্বি-চক্র যান	”	৫০২	১১৫৬	২২৭৪৭	১৫১২৫১
৩.	**ব্যবসায়িক যানবাহন**					
	i) ভারী	”	১৮৯৭	২৭২৪	৭৪৩৯	১৬৩০৯
	ii) হাল্কা	”	২৮৪	২৮১	২৯৯৪	৯২৬৪
	iii) তিন চাকার যান	”	০৮	১০১	৭৮৯	২০৩৬৩

সরকারি ভবন

একটি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত পরিকাঠামোর প্রয়োজন তার মধ্যে সরকারি ঘরবাড়িও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ করা গেছে। একটি নতুন ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স্ গড়ে তোলা হয়েছে। এই কমপ্লেক্সে রয়েছে — একটি নতুন সচিবালয় কমপ্লেক্স, হাইকোর্ট কমপ্লেক্স, রাজ্য অতিথিশালা, (স্টেট গেস্ট হাউস) এবং বিধানসভা ভবন। নতুন রাজ ভবন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতিকালে আরো যেসব সরকারি ভবন তৈরি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল প্রজ্ঞা ভবন (একটি কনভেন্‌শন্‌ সেন্টার), ধলাই জেলার প্রধান কার্যালয় ইত্যাদি। এ সমস্ত ভবনগুলি আধুনিক নির্মাণ কৌশল অবলম্বন করেই নির্মাণ করা হয়েছে।

রেল যোগাযোগ

১৫৮ কি.মি. রেল লাইন নির্মাণের মধ্য দিয়ে বর্তমানে আগরতলা পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালু করা সম্ভব হয়েছে। যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি আগরতলা পর্যন্ত আসে আর মালবাহী ট্রেনগুলি আসে জিরানীয়া পর্যন্ত। ত্রিপুরার দক্ষিণতম জেলা সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই রেল লাইন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং তা ২০১৪ -এর মার্চের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে বাংলাদেশের রেল লাইনের সাথে আগরতলাকে জুড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের রেল সংযোগ স্থাপিত হলে এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রেল দপ্তর লামডিং থেকে আগরতলা পর্যন্ত মিটার গেজ লাইনকে ব্রড গেজ-এ রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই কাজ এগিয়ে চলেছে এবং ২০১৩ -এর ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে রেল-এর মাধ্যমে মালপত্র পরিবহনে সুবিধে হবে এবং দেশের রেল নেটওয়ার্ক -এর সাথে এখানকার রেল লাইনকে সহজভাবেই জুড়ে দেওয়া যাবে। ১৯৭২ থেকে

ত্রিপুরায় রেল লাইনের সম্প্রসারণের চিত্র নীচে তুলে ধরা হল :

বিষয়	ইউনিট	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
রেল লাইনের দৈর্ঘ্য	কি.মি.	১৫	১৫	৪৮	১৫৮
রেল স্টেশন	সংখ্যা	৩	৩	৬	১৬

বিমান যোগাযোগ

দেশের অন্যান্য অংশের সাথে যোগাযোগের জন্য ত্রিপুরা মূলত বিমান সংযোগের উপরই নির্ভরশীল। আগরতলা বিমান বন্দরটিই এই রাজ্যের মূল সচল বিমান বন্দর। এই বিমান বন্দরে ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম (আই এল এস) ভিজিবিলিটিতেও বিমান অবতরণ করতে পারে। এখানে রাতে বিমান অবতরণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে আগরতলা বিমান বন্দরে ১৭৬টি ফ্লাইট ওঠা-নামা করছে। এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো, স্পাইস জেট, জেট এয়ারওয়েজ-এর মতো বড়ো বড়ো এয়ারলাইনস্‌গুলি পরিষেবা দিচ্ছে ত্রিপুরাতে। এখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গুয়াহাটির পরই দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমান বন্দর হচ্ছে আগরতলা বিমান বন্দরটি। ত্রিপুরা এবং দেশের অন্যান্য শহরের মধ্যে যাতায়াতকারী বিমান যাত্রীর সংখ্যাও খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেমন দেখা যাচ্ছে নীচের টেবিলে :

বিষয়	ইউনিট	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
প্রতি সপ্তাহে ফ্লাইট	সংখ্যায়	২০	২০	২৩	১৭৬

ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য বিদেশী শহরগুলির সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আগরতলা বিমান বন্দরটিকে একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীত করার জন্য রাজ্য সরকার ভারত সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। কৈলাশহর এবং কমলপুরের বিমানবন্দরগুলিকে পুনরায় চালু করার জন্যও আলোচনা চলছে।

বিদ্যুৎ

বিগত বছরগুলিতে ত্রিপুরায় বিদ্যুতের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরার মোট বিদ্যুৎ ভোক্তার সংখ্যা হচ্ছে ৫,২৯,২৮৪ যার মধ্যে ৪,৭১,০৭৯ হচ্ছে গৃহস্থালীর ভোক্তা। বাড়িঘরেই সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হচ্ছে। তারপর রয়েছে ব্যবসায়িক ও শিল্প ক্ষেত্রের ব্যবহার। গড়ে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মাসুল হচ্ছে ৫.৮৬ টাকা। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের ভর্তুকির পর তা এসে দাঁড়ায় ৩.৮৫ টাকায়। সাধারণত সেচ ও পানীয় জল সরবরাহের জন্য যেসব প্রকল্প রয়েছে সেগুলিতে পাম্প মেশিন চালানোর ফলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয় তা মূলত রাজ্য সরকারই বহন করে থাকে। ২০০৫-এর ১লা জানুয়ারি তারিখে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড্ (টি এস ই সি এল) গঠনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এক মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন এসেছে। এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ও বন্টন সবকিছুর দায়িত্বে রয়েছে এই কর্পোরেশন।

বর্তমানে রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো হচ্ছে টি এস ই সি এল -এর উৎপাদিত বিদ্যুৎ এবং সেন্ট্রাল পুল থেকে আমদানি করা বিদ্যুৎ দিয়ে। টি এস ই সি এল - এর পরিচালনাধীন ইউনিটগুলি হচ্ছে রুখিয়া, বড়মুড়া এবং গোমতী। প্রথম দুটি হচ্ছে গ্যাস ভিত্তিক প্রকল্প যেগুলির উৎপাদন ক্ষমতা যাথাক্রমে ৭৪ মেগাওয়াট এবং ৪২ মেগাওয়াট। গোমতীর প্রকল্পটি হচ্ছে জল বিদ্যুৎ প্রকল্প। এটির ক্ষমতা ১৫ মেগাওয়াট হলেও উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ৮ মেগাওয়াট। ২০১০-এর সেপ্টেম্বরে বড়মুড়ায় একটি গ্যাস ভিত্তিক ২১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। ২০১৩-র মধ্যে রুখিয়ায় দুটি ৮ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন প্রকল্পের পরিবর্তে একটি ২১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ইউনিট চালু করা হবে। তাছাড়া, টি এস ই সি এল ওপেন-সাইকেল প্রকল্পগুলিকে কম্বাইনড্ সাইকেল প্রকল্পে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এতে ৩০ মেগাওয়াট বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

এগুলি ছাড়াও ত্রিপুরায় দুটি বড় মাপের গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মীয়মান রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে গোমতী জেলার পালাটানায়। এটা সম্পূর্ণ হলে এখান থেকে ৭২৬.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। এখান থেকে ত্রিপুরা পাবে ১৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। প্রকল্পটি নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে ও এন জি সি - ত্রিপুরা পাওয়ার কোম্পানি (ও টি পি সি) যা হচ্ছে ত্রিপুরা সরকার , ও এন জি সি এবং ইনফ্রাস্ট্রাক্চার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড্

(আই এল এন্ড এফ এস)-এর একটি যৌথ উদ্যোগ। দ্বিতীয় প্রকল্পটি হচ্ছে সিপাহীজলা জেলার মনারচক-এ। এখানে ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে এবং পুরোটাই পাবে ত্রিপুরা। এই প্রকল্পটি নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে নীপকো। বর্তমানে পশ্চিম জেলার কাছে রামচন্দ্রনগরেও নীপকোর একটি ৮৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু রয়েছে। পালাটানার প্রকল্পটি ২০১২-র মধ্যেই শেষ হওয়ার কথা। আর মনারচক এর প্রকল্পটির জন্য ধার্য সময়সীমা হচ্ছে ২০১৩ সাল। এ সমস্ত প্রকল্পগুলি চালু হলে ত্রিপুরা তার বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে। ১৯৭২ থেকে ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ পরিকাঠামো সম্প্রসারণের একটি চিত্র নীচে তুলে ধরা হল :

ক্রমিক নং	বিষয়	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	ভোক্তা সংখ্যা	৭,৬৬৬	১৪,৭০০	১,৪৯,৬৩৭	৫,২৯,২৮৪
২.	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা (মেগাওয়াট)	৩	৮.৫	১০১	২২১
৩.	রাজ্যের উৎপাদন (মেগাওয়াট)	৩	১৫	৫৭.৬০	১০৬
৪.	হাইটেনশন লাইন (সার্কিট কি.মি.)	৬১৮	১২৭৮	৪,৬০৫	১১,৬৪০
৫.	লো টেনশন লাইন (সার্কিট কি.মি.)	২৬৫	১,৪৬৫	৪,১৭৩	১৮,৫৯৫
৬.	বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	৬৮	৮৫	৮০৮	১০২০

রাজ্যের সমস্ত বসতিগুলিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে জুড়ে দেওয়া এবং সমস্ত বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে।

টেলি যোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি

ক) টেলি যোগাযোগ

ত্রিপুরাতে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন ঘটেছে। বি এস এন এল হচ্ছে মূল পরিষেবা প্রদানকারী পরিষেবা সংস্থা। তাছাড়াও রাজ্যে বেসরকারী পরিষেবা প্রদানকারী কোম্পানী যেমন এয়ারসেল, এয়ারটেল, টাটা টেলি সার্ভিসেস্, ভোদাফোন, রিলায়েন্স, আইডিয়া, এস টেল ইত্যাদি কোম্পানীর পরিষেবা চালু রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ১৬.০০ লক্ষ মোবাইল ফোনের ভোক্তা রয়েছে।

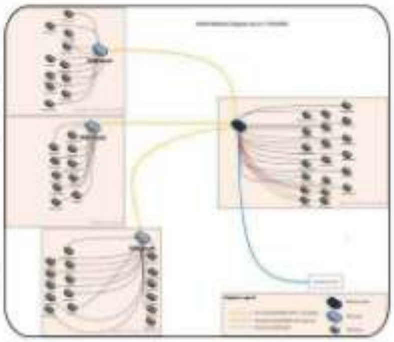

ল্যান্ড লাইন টেলিফোনের জন্য বি এস এন এল-এর ৮৪টি এক্সচেঞ্জ রয়েছে যার মাধ্যমে ৫৫,৫৬১ জন ভোক্তাকে পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। ডি এস এল এ এম, ওয়াই-ম্যাক্স, জি পি আর এস এবং ডব্লিউ এল এল নির্ভর ই ভি ডি ও—এই চার প্রকার প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্রড ব্যান্ড পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। মোবাইল পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে টু জি এবং থ্রী-জি প্রযুক্তিগত প্যাটফর্মের মাধ্যমে। সোয়ান, টেলি-মেডিসিন, হাই-স্পীড ব্রড ব্যান্ড পরিষেবার জন্য লীজড্ লাইন-ও ব্যবহার করা হচ্ছে। নীচের টেবিলে রাজ্যে টেলি-যোগাযোগের ব্যবস্থা সম্প্রসারণের একটি চিত্র তুলে ধরা হল :

ক্রমিক নং	বিষয়	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা (ল্যাণ্ড লাইন)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৩৪,৫১৯	৫৫,৫৬১
২.	গ্রামীণ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৫৫	৬৫
৩.	আরবান টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সংখ্যা	”	”	প্রযোজ্য নয়	১৯
৪.	মোবাইল পরিষেবা (ভোক্তার সংখ্যা)	নেই	নেই	নেই	১৬ লক্ষ
৫.	ব্রডব্যান্ড (ভোক্তা সংখ্যা)	”	”	”	১১,৮৬১
৬.	টেলিফোন ঘনত্ব	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১.১	৪২.৪৪

ত্রিপুরা এখন মেঘালয় এবং আসাম এর মধ্য দিয়ে দেশের বাকি অংশের সাথে যুক্ত। সেজন্য অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল (ও এফ সি) এবং একটি মাইক্রোওয়েভ লিংক ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মাধ্যমে ত্রিপুরার সাথে দেশের বাকি অংশের সংযোগ স্থাপনের জন্যও চেষ্টা করা হচ্ছে।

খ) তথ্য প্রযুক্তি

সুষ্ঠুভাবে নাগরিকদের ই সার্ভিস প্রদানের জন্য তথ্য প্রযুক্তি -ভিত্তিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে :

- **স্টেট ড্যাটা সেন্টার (এস ডি সি)**

  আই টি বা তথ্য প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর একটা বিশেষ উপাদান হচ্ছে এস ডি সি। সরকারি কাজে ব্যবহৃত বা ব্যবহার করা হবে এমন সব ই-গভারন্যান্স অ্যাপ্লিক্যাশন-এর জন্য প্রয়োজনীয় ড্যাটার কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হচ্ছে এই এস ডি সি। ত্রিপুরা রাজ্যে এই এস ডি সি স্থাপন করা হয়েছে আগরতলায় এবং ২০১০ সাল থেকে এটি চালু রয়েছে।

- **ত্রিপুরা স্টেট ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (সোয়ান)**

  ড্যাটা, বয়েস এবং ভিডিও পরিবহনের জন্য সোয়ান হচ্ছে একটি ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক যা ব্লক স্তর পর্যন্ত ও এফ সি সংযোগ দিচ্ছে। ২০০৯ থেকে ৬০টি পয়েন্ট অফ প্রেজেন্স (পি ও পি) সহ ত্রিপুরায় একটি পুরোদমে সোয়ান চালু রয়েছে। এমনকী পুরোমাত্রায় সোয়ান চালু করার ক্ষেত্রে সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা ষষ্ঠ রাজ্য এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথম রাজ্য।

- **আগরতলা সিটি এরিয়া নেটওয়ার্ক (এ সি এ এন)**

  আগরতলায় বিভিন্ন কার্যালয়কে ও এফ সি নেটওয়ার্ক-এর সাথে জুড়ে দিতে এ সি এ এন স্থাপন করা হয়েছে। নাগরিকদের বিভিন্ন ই-গভারন্যান্স -এর পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এ সি এ এন নেটওয়ার্কের মেরুদণ্ড বলে বিবেচিত হয়। এ সি এ এন পুরোদমে সোয়ান -এর সাথে যুক্ত।

- **কমন সার্ভিস সেন্টার (সি এস সি)**

  কমন সার্ভিস সেন্টার হচ্ছে গ্রামীণ স্তরের কেন্দ্র যার মাধ্যমে সমস্ত নাগরিকদের ই-গভারন্যান্স পরিষেবা দেওয়া হবে । প্রতিটি সি এস সি-র আওতায় রয়েছে ৬টি সেনসাস্ ভিলেজ। ত্রিপুরাতে মোট ১৪৫টি সি এস সি স্থাপন করা হয়েছে।

এভাবেই রাজ্যে ই-গভারন্যান্স পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার আই টি পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে এই পরিষেবার আওতায় আনার জন্য নেটওয়ার্ককে আরো সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। ১৯৭২ সাল থেকে রাজ্যে আই টি ক্ষেত্রে লব্ধ উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত চিত্র নীচে দেওয়া হল :

ক্রমিক নং	বিষয়	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	স্টেট ড্যাটা সেন্টার	-	-	-	১
২.	রাজ্যে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের সংখ্যা পি ও পি এস	-	-	-	৬০
৩.	আগরতলা সিটি এরিয়া নেটওয়ার্ক (অন্তর্ভুক্ত অফিসের সংখ্যা)	-	-	-	২৩
৪.	কমন সার্ভিস সেন্টারের সংখ্যা	-	-	-	১৪৫

মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিদ্যালয় শিক্ষা

বিদ্যালয় শিক্ষাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হল মৌলিক / এলিমেন্টারী (I থেকে ক্লাস VIII পর্যন্ত), সেকেন্ডারী / মধ্য শিক্ষা (IX ক্লাস থেকে X) এবং উচ্চ মধ্যশিক্ষা বা হায়ার সেকেণ্ডারী (ক্লাস XI থেকে XII পর্যন্ত)। বিদ্যালয়ের সুবিধা প্রদান, ছাত্রছাত্রী ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ, পরিকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদির নিরিখে বিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্যে অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে। ''সবার জন্য শিক্ষা'' কথাটিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজ্য সরকার শিশুদের বিনামূল্যে

এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯-কে (রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রী এন্ডকমপালসারি এডুকেশন অ্যাক্ট-২০০৭) সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এই আইনে ৬-১৪ বছর বয়সের শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে সরকার সর্ব শিক্ষা অভিযান (এস এস এ), রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (আর এম এস এ), মিড্ ডে মিল্ এবং আরো কিছু কর্মসূচী রূপায়ণ করে চলেছে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে শিশুরা যেভাবে বিদ্যালয় ছেড়ে যেত তার হার ক্রমাগত কমছে। তাছাড়া, বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে যে লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান, ত্রিপুরাতে এই প্রথা লক্ষ করা যায় না। শিক্ষা ক্ষেত্রে ত্রিপুরার লিঙ্গ সাম্য (জেন্ডার প্যারিটি ইন্ডেক্স) পাওয়া গেছে তা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে ০.৯৬ শতাংশ এবং উচ্চ প্রাথমিকস্তরে ০.৯৭ শতাংশ। এমনকী ২০১১ জনগণনার উপর ভিত্তি করে ত্রিপুরাকে ২০০১-২০১১ সময়কালে পুরুষ ও মহিলা সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম পার্থক্যের জন্য জাতীয় স্তরে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই সময়ে ত্রিপুরাতে পুরুষদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায় ১১.১৮ শতাংশ এবং মহিলা সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায় ১৮.২৪ শতাশ।

	বিষয়		ইউনিট	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	বিদ্যালয়ের সংখ্যা						
	i)	জুনিয়র বেসিক	সংখ্যা	১,৪২৮	১,৫২৮	২,০৬৩	২,২৯৮
	ii)	সিনিয়র বেসিক	”	২৩৬	২৮২	৪১৭	০১,২৩০
	iii)	সেকেন্ডারী	”	২৯	১০৫	৩৮৪	৫৭৫
	iv)	হায়ার সেকেন্ডারী	”	৭০	৩০	২০২	৩৫২
	v)	মাদ্রাসা	”	-	-	১২৯	১৮০
		মোট		১,৭৬৩	১,৯৪৫	৩,১৯৫	৪,৬৩৫
২.	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা						
	i)	প্রাথমিক স্তর (I - V)	সংখ্যা	১৭২৮৯৫	১৯৮১০৪	৪৭৩১৬১	৩৯২১৩২
	ii)	উচ্চ প্রাথমিক(VI - VIII)	”	৪১৪২৭	৪৮৯৩৬	১৫১০০৭	২২২৩১৭
	iii)	সেকেন্ডারী (IX - X)	”	১৬৪০০	১৮৮১১	৬৮৩৭৪	১২৭০২২
	iv)	হায়ার সেকেন্ডারী (XI - XII)	”	৫৪৯৮	৩০৯২	২৫৮০৮	৪৬৭৮৬
		মোট		২৩৬২২০	২৬৮৯৪৩	৭১৮৩৫০	৭৮৮২৫৭

৩.	শিক্ষকের সংখ্যা						
	i)	জুনিয়র বেসিক	সংখ্যা	৩৫৮৫	৩৯১১	৯৮৮৯	৭৮৮৮
	ii)	সিনিয়র বেসিক	”	২২৫৫	২৫৭৮	৬৫৪৭	১২৮২৬
	iii)	সেকেন্ডারী	”	৩১৬	১৯৮৬	৮৯৮২	১০,৪৩৮
	iv)	হায়ার সেকেন্ডারী	”	২০৮৮	১০৫৭	৮৯১১	১০,৮৮৫
		মোট		৮২৪৪	৯৫৩২	৩৪৩২৯	৪২,০৩৭
৪.	সাক্ষরতার হার		%	৩০.৯৮	৪২.১২	৭৩.২০	৮৭.৭৫
	(জনগণনার তথ্য অনুযায়ী)			(১৯৭১)	(১৯৮১)	(২০০১)	(২০১১)
৫.	ড্রপ-আউট হার						
	i)	১ম - ৫ম শ্রেণী	%	৬৩.৯২	৭২.২০	৫০.১৩	০৩.৬১
	ii)	১ম - ৮ম শ্রেণী	%	৭৬.৬১	৭৭.৪০	৬৮.৪২	০৯.০৫
৬.	বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা			২৪	২৪	৬৪	১৬৫
৭.	মিড্-ডে-মিল		-	-	-	৪৭৩১৬১	৫৮০৪৮
৮.	পানীয় জলের সুবিধা						
	i)	জুনিয়র বেসিক	সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়	৩১২	২২২	১,৫৪৭
	ii)	সিনিয়র বেসিক	”	”	১৪৪	১৫৬	১০০৫
	iii)	সেকেন্ডারী	”	”	৭১	২২৪	৫০৪
	iv)	হায়ার সেকেন্ডারী	”	”	৩০	১২৯	৩৩৭
		মোট			৫৫৭	৭৩১	৩৩৯৩

উচ্চশিক্ষা

ত্রিপুরায় উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রের বিকাশের ইতিহাসে ১৯৯৯-২০১২ সময়ে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন লক্ষ করা গেছে। এই সময়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে উঠে। সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। এসব উদ্যোগের ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মোট ভর্তির হার (গ্রস এনরোলমেন্ট্ রেসিও বা জি ই আর) ৭.২৪ থেকে বেড়ে ১১.৪-এ পৌঁছে। বিগত দশকে (২০০২-২০১২) সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে মোট ২৯,০৫৩ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে অন্যতম হল :

- ২০০৬ সালে ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে (টি ই সি) একটি পুরোপুরি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট্ অফ্ টেকনোলজি (এন আই টি) -এ উন্নীত করা হয় ; ২০০৭-এ নরসিংগড় -এর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটটিকে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজি-তে (টি আই টি) উন্নীত করা হয় —এতে ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি দুই রকম কোর্স করার সুবিধা রয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রী ধারণের ক্ষমতা ২৫০ থেকে বেড়ে ৯৭৭-এ দাঁড়িয়েছে।

- দুটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে যেখানে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৬০টি আসন রয়েছে। তাছাড়া একটি কৃষি মহাবিদ্যালয় এবং একটি ভেটেরিনারী কলেজও স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে ত্রিপুরাতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে। আর একটি ফিশারী কলেজ তো আগে থেকেই চালু ছিল।
- হাপানিয়াতে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হয়েছে। উদয়পুরের ফুলকুমারী, ধলাই জেলার আমবাসায়, উত্তর ত্রিপুরা জেলার বাগবাসায় এবং ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকাধীন খুমুলুঙ-এ আরো চারটি নতুন পলিটেকনিক স্থাপন করা হচ্ছে। আমবাসার পলিটেকনিকটি ইতিমধ্যেই পুরোনো জেলাশাসক অফিস কমপ্লেক্সে কাজ করতে শুরু করেছে। আমবাসা, বাগবাসা এবং ফুলকুমারীর পলিটেকনিকের জন্য ইতিমধ্যে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

- মোহনপুর, বিশালগড়, শান্তিরবাজার, লংতরাইভ্যালী, কাঞ্চনপুর এবং তেলিয়ামুড়া — এই ছয়টি নতুন কলেজ ভবনের নির্মাণ শেষ হওয়াতে ইতিমধ্যেই ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে এগুলি চালু হয়েছে। তাছাড়া, রাজ্যের প্রত্যন্ত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাতে উচ্চ শিক্ষার সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি সরকারী বিদ্যালয়ের একটা অংশে ২০১১ থেকে গন্ডাছড়া ডিগ্রি কলেজ চালু করা হয়েছে। তবে এই কলেজের জন্য ভবন নির্মাণের কাজও তারপর শুরু করা হয়েছে।

- ছাত্রছাত্রীদের যাতে চাকুরী পেতে সুবিধা হয় সেজন্য রাজ্যের নয়টি জেনারেল ডিগ্রি কলেজে বি সি এ এবং ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার এপ্লিকেশন (ডি সি এ) কোর্স চালু করা হয়েছে।
- ৯টি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে। বাকী কলেজগুলিতেও ধাপে ধাপে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- কুমারঘাটে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কলেজ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কুঞ্জবনে ইনস্টিটিউট অফ এডভান্স স্টাডিজ্ -এর নতুন ভবন এবং কলেজটীলায় সরকারী ল কলেজ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।
- নতুন ভবন নির্মাণসহ নতুন স্থানে সরকারী মিউজিক কলেজ এবং গভর্নমেন্ট কলেজ অফ্ আর্ট এন্ড ক্রাফট-এর পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতেও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা লাভের জন্য সুযোগ হয়েছে।

রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসারকে আগামী দিনগুলিতে ত্বরান্বিত করতে রাজ্য সরকার একটি দশবর্ষীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২০) গ্রহণ করেছে এবং এটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৯৭২ সাল থেকে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নীচে তুলে ধরা হল :

কলেজ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
সাধারণ ডিগ্রি কলেজ এর সংখ্যা	৬	৬	১৪	২৪
বেসরকারী কলেজ সহ- ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১	১	১	২
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	১	১	১	৩
মেডিক্যাল কলেজ	০	০	০	২
পেশাদারী শিক্ষার কলেজ (শিল্প ও কারু, বি এড, মিউজিক, ল, প্যারামেডিক্যাল ইত্যাদি)	৩	৪	৪	৬
কৃষি মহাবিদ্যালয়	০	০	০	১
ভেটেরিনারী কলেজ	০	০	০	১
ফিশারী কলেজ	০	০	০	১
মোট	১১	১২	২০	৩৪

সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা

মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, দুর্বল ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সুষ্ঠু উন্নয়নের ব্যাপারটি রাজ্য সরকার অগ্রাধিকারের সাথে বিবেচনা করে আসছে। নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প (ক্স১আই সি ডি এস--এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সরকার যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বর্তমানে রাজ্যে এই প্রকল্পে ৯৯০৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪.৭৪ লক্ষ-রও বেশি শিশু ও মা উপকৃত হচ্ছেন।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্যও রাজ্য সরকার বেশ কিছু কর্মসূচী রূপায়ণ করছে। মহিলাদের উপর হিংসাত্মক কার্যকলাপ রুখতে সরকার প্রোটেকশন অফ উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োল্যান্স

অ্যাক্ট - ২০০৫ অনুযায়ী ৬০ জন গেজেটেড অফিসার এবং ৪ জন সমাজসেবী মহিলাকে প্রোটেকশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেছে (ভারতের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ সংখ্যা-। মহিলাদের সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। কর্মরত মহিলাদের জন্য আগরতলা শহরের বুকে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর নামানুসারে একটি হোস্টেল গড়ে তোলা হয়েছে।

দরিদ্র, বৃদ্ধ ও সমাজের অসহায় মানুষদের কল্যাণে রাজ্য সরকার ১৯৭৮ সালে সামাজিক সুরক্ষা পেনশন প্রকল্প চালু করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অংশীদারিত্বে চালু ৩টি যৌথ প্রকল্প ছাড়াও বর্তমানে রাজ্য সরকারের অর্থে পরিচালিত বেশ কয়েকটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু রয়েছে রাজ্যে। বর্তমানে এসব প্রকল্পে ২.২৪ লক্ষ জন সুবিধাভোগী রয়েছেন।

বৃদ্ধ নাগরিকদের ব্যাপারেও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি রয়েছে। সরকার মাতা-পিতার ও বৃদ্ধ নাগরিকদের ভরণপোষণ ও কল্যাণে প্রণীত আইনকে (মেইনটেন্যান্স এন্ড ওয়েলফেয়ার অফ্‌প্যারেন্টস্ এন্ডসিনিয়র সিটিজেনস্ অ্যাক্ট, ২০০৭- রূপায়ণ করে আসছে এবং সেজন্য মহকুমা শাসকদের ট্রাইবুন্যাল এবং সমাজ শিক্ষায় জেলা ইনস্‌পেক্টরদের মেইনটেন্যান্স অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেছে। তাছাড়া বৃদ্ধ নাগরিকদের জন্য কুঞ্জবনে একটি 'পেনশনার্স আবাসন' নির্মাণ করা হচ্ছে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণেও সরকারের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের মধ্যে একটি। এদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পাঁচটি পেনশন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। আগরতলায় হেলেন কেলারের নামে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থ এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে ১৯৭২ থেকে যে প্রকার প্রগতি এসেছে তার একটি চিত্র নীচে তুলে ধরা হল :

	বিষয় ইউনিট	ইউনিট	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১।	নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প (আই সি ডি এস)					
ক)	আই সি ডি এস প্রকল্প	সংখ্যা	০	০২	২৮	৫৬
খ)	অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	সংখ্যা	০	২০৮	৩৫৩৭	৯৯০৬
গ)	কতজন শিশু এর আওতায় এসেছে	সংখ্যা	০	৩৫০০	১৪২০০০	৩৭৬০৬১
ঘ)	কতজন মা এর আওতায় এসেছেন	সংখ্যা	০	০	১৬৬৪৬	৯৮১১৩
ঙ)	অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	০	০	০	৮২৯৪
চ)	সবলা (বয়ঃসন্ধি মেয়েদের জন্য)	সংখ্যা	০	০	০	১৭০৪৮৮
ছ)	আই.এম.জি এস. ওয়াই. (গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েদের জন্য প্রকল্প)	সংখ্যা	০	০	০	৯০৬৮
২।	সামাজিক সুরক্ষা পেনশন প্রকল্প					
i)	বৃদ্ধদের জন্য পেনশন	সংখ্যা	০	৮৫০৫	৮৫০৫	১৯৯৮ সালে জাতীয় বৃদ্ধ ভাতা প্রকল্পের সাথে মিশে যায়
ii)	জুমিয়া পেনশন	সংখ্যা	০	০	২৫০৫	
iii)	বিধবা ভাতা বা পেনশন	সংখ্যা	০	০	৪২০২	
iv)	ত্রিপুরা রিক্সা শ্রমিক পেনশন	সংখ্যা	০	০	১৬৭	
v)	ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য পেনশন	সংখ্যা	০	০	৩৮৭৪	
ক)	জাতীয় বৃদ্ধ ভাতা	সংখ্যা	০	৮৫০৫	৬০৪১২	১৫২৫৫০
খ)	জাতীয় বিধবা ভাতা	সংখ্যা	০	০	০	৭৪৩২
গ)	জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা	সংখ্যা	০	০	০	২৪২৬
ঘ)	অন্ধ ও প্রতিবন্ধীদের ভাতা (৬০ শতাংশের বেশি অক্ষমতা থাকলে)	সংখ্যা	০	০	০	১৫৪৯
ঙ)	অন্ধ ও প্রতিবন্ধী ভাতা	সংখ্যা	০	০	৩০৯১	৪৫৩১

চ)	বিধবা ও পরিত্যক্ত মহিলাদের পেনশন	সংখ্যা	০	০	০	৩৮৩৫৮
ছ)	ত্রিপুরা রিক্সা শ্রমিকদের পেনশন	সংখ্যা	০	০	০	৬৪
জ)	ত্রিপুরা চর্মকার পেনশন	সংখ্যা	০	০	০	৩২
ঝ)	বালিকা শিশুর জন্য সুযোগ সুবিধা	সংখ্যা	০	০	০	১৪৫৬৩
ঞ)	বিড়ি শ্রমিকদের জন্য পেনশন	সংখ্যা	০	০	০	৬৯
ট)	১০০ শতাংশ অন্ধ বেকারদের ভাতা	সংখ্যা	০	০	০	৩৪
ঠ)	১০০ শতাংশ অন্ধদের জন্য পেনশন	সংখ্যা	০	০	০	৪৫৬
৩।	**মহিলা কল্যাণ**					
ক)	রানী লক্ষ্মীবাই স্মৃতি হোস্টেল (কর্মরত মহিলাদের জন্য)	সংখ্যা	০	০	০	১
খ)	প্রোটেকশন অফিসার নিয়োগ (পি ডব্লিউ ডি ভি আইন ২০০৫ অনুযায়ী)	সংখ্যা	০	০	০	৬৪
গ)	মহিলাদের জন্য টোল ফ্রী হেলপ্ লাইন	সংখ্যা	০	০	০	১
৪।	**বয়স্ক নাগরিকদের কল্যাণ**					
ক)	পেনশনার আবাস	সংখ্যা	০	০	০	নির্মীয়মাণ
৫।	**শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ**					
ক)	ডিষ্ট্রিক্ট ডিস্এবিলিটি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার (ডি.ডি.আর.সি.)	সংখ্যা	০	০	০	৪
খ)	ব্রেইল প্রিন্টিং প্রেস	সংখ্যা	০	০	০	২
গ)	হেলেন কেলার মেমোরিয়াল রেস্ট্ হাউস	সংখ্যা	০	০	০	১
ঘ)	ডি.ডি.আর.সি.-র মাধ্যমে কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং এইডস্-এর চিকিৎসা সামগ্রী বিতরণ	সংখ্যা	০	০	০	৫৮৫৫
ঙ)	রাজ্যে ডিস্এবিলিটি সার্টিফিকেট প্রদান	সংখ্যা	০	০	০	৫৭১৫৩

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করাই হচ্ছে ত্রিপুরা সরকারের লক্ষ্য। স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল হওয়ার পক্ষপাতী নয় রাজ্য সরকার। রাজ্যবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক, প্রতিকারমূলক এবং সচেতনতামূলক পরিষেবা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য সরকার অবিরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রকল্প তৈরী করে রূপায়ণ করছে। পরিকাঠামো, ঔষধ ও মানব সম্পদের দিক থেকে হাসপাতাল পরিষেবাকে প্রাথমিক দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে উন্নত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। রাজ্যে মেডিক্যাল ও প্যারা মেডিক্যাল শিক্ষার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাতে রাজ্যে প্রশিক্ষিত ভাল মানব সম্পদের অভাব না হয়।

সমস্ত স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা তথা পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। বহু নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্রও নির্মাণ করা হচ্ছে। মহকুমা, জেলা ও রাজ্য স্তরে চিকিৎসার পরিকাঠামোকে আরো মজবুত করা হচ্ছে। বিভিন্ন উপজাতি এলাকার ১৫টি জায়গায় (ধলাই-৯টি, উত্তর জেলা -৪টি এবং পশ্চিম জেলা-২টি) এখনো প্রথাগতভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়নি। একটি মাস্টার প্ল্যানের অঙ্গ হিসেবে এসমস্ত জায়গায় হেলিকপ্টার দিয়ে মেডিক্যাল টীম পাঠিয়ে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ১৯৭২ সাল থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোতে যে ধরনের উন্নতি হয়েছে তা নীচে তুলে ধরা হল :

	বিষয়	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১।	মেডিক্যাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান				
ক)	মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	-	-	-	২
খ)	রাজ্য হাসপাতাল একটি আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক সহ)	২	২	৬	৬
গ)	জেলা হাসপাতাল	২	২	২	২ (আরো একটি চালু করা হচ্ছে)
ঘ)	মহকুমা হাসপাতাল	৭	৮	১১	১১ (দুটি নির্মীয়মাণ)
ঙ)	কমিউনিটি হেলথ্ সেন্টার	২	২	১০	১২ (আরো ৭টি গড়ে তোলা হচ্ছে)
চ)	প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২২	২৯	৭৩	৭৯ (আরো ৩৩টি নির্মীয়মাণ)
ছ)	উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১০৩	২২৮	৩৯	৬৮১ (১৭০টি নির্মীয়মাণ)
জ)	ফার্মেসি কলেজ, আগরতলা (রিপস্যাট)	-	-	১	১
ঝ)	প্যারা-মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন (পি.পি.পি. মডেল)	-	-	-	১
ঞ)	নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট্ (জি. এন. এম.)	১	১	২	২
ট)	ব্লাড ব্যাঙ্ক	১	-	৫	৭
ঠ)	ব্লাড স্টোরেজ সেন্টার	-	-	-	৭
ড)	জি. বি. পি. হাসপাতাল এবং আই. জি. এম. হাসপাতালের সাথে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে সংযুক্ত বাইরের হাসপাতাল	-	-	১১	১৭
ঢ)	আই.জি.এম.-এর সাথে যুক্ত টেলি-অপথ্যালমোলোজি (ভিশন সেন্টার)	-	-	-	৪০
২।	স্বাস্থ্য পরিষেবায় মানব সম্পদ				
ক)	মেডিক্যাল অফিসার (অ্যালোপ্যাথি)	১২৫	২৫৮	৩৯৬	৮১৬
খ)	মেডিক্যাল অফিসার (আয়ুর্বেদিক)	৩	৫	৩৭	৫৩
গ)	মেডিক্যাল অফিসার (হোমিওপ্যাথিক)	৩	৭	৪৬	৫১
ঘ)	ডেন্টাল সার্জন	-	৫	৩৮	৪১
ঙ)	মেডিক্যাল অফিসার (স্পেশালিস্ট) অ্যালোপ্যাথি	৪০	৭৭	১৪৫	২৬৯

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শিশু-মৃত্যুর হার কমাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মহকুমা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল এবং রাজ্য হাসপাতালগুলিতে নবজাত শিশুর চিকিৎসা কেন্দ্র, অ্যান্টি ন্যাটাল ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিট এবং নবজাত শিশুর বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলারা যাতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে তাঁদের শিশুকে জন্ম দেন সেজন্যও রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। সার্বজনীন রোগ প্রতিরোধের (ইমিউনাইজেশন) উদ্দেশ্যে সার্বজনীন রোগ প্রতিরোধক কর্মসূচী, হেপাটাইটিস্ বি টীকাকরণ, হাম চিকিৎসা শিবির ইত্যাদি কর্মসূচী রূপায়ণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যালয় শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের কর্মচারীদের মাধ্যমে বয়ঃসন্ধি কালীন মেয়েদের সাপ্তাহিক আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড পরিপূরক সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার জন্যও উপযোগী প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ-সুবিধাকে উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার ফলে বিগত বছরগুলিতে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য সূচকে উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে এবং তা জাতীয় গড়-এর তুলনায় ভাল, যা নীচের টেবিলে দেওয়া হলো :

বিষয়	বর্তমান অবস্থান			
	ভারত	ত্রিপুরা	ভারত	ত্রিপুরা
জন্মের হার (প্রতি হাজারে)	২৬.৫	১৭.৬ (এস আর এস-১৯৯৮)	২২.১	১৪.৯ (এস আর এস-২০১০)
মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৯.০	৬.১ (এস আর এস-১৯৯৮)	৭.২	৫.০ (এস আর এস-২০১০)
প্রাকৃতিক বৃদ্ধির হার (প্রতি হাজারে)	১৭.৫	১১.৬ (এস আর এস-১৯৯৮)	১৪.৯	৯.৯ (এস আর এস-২০১০)
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৭২.০	৪৯.০ (এস আর এস-১৯৯৮)	৪৭.০	২৭.০ (এস আর এস-২০১০)
লিঙ্গ হার (প্রতি হাজার পুরুষে মহিলাদের সংখ্যা)	৯৩৩	৯৪৮ (জনগণনা-২০০১)	৯৪০	৯.৬১ (জনগণনা-২০১১)

রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন | কৃষি

ত্রিপুরার অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। এখানে রয়েছে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। আছে উৎসাহী কৃষক সমাজ। ত্রিপুরায় কর্মসংস্থানেও কৃষির ভূমিকাই বেশী। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GSDP) ২২ শতাংশ আসে কৃষি থেকে।

২০০০-০১ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে রাজ্য সরকার একটি দশবর্ষীয় পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যা পরবর্তী সময়ে ২০১১-১২ পর্যন্ত দুবছরের জন্য বাড়ানো হয়। এই সময়ে সম্মিলিত এক প্রচেষ্টার ফলে রাজ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৯-২০০০ সালে রাজ্যে যেখানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৫.১৩ লক্ষ এম টি, সেখানে ২০১১-১২ তে খাদ্য শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৭.৩০ লক্ষ এম টি—যা সর্ব সময়ের সেরা। ফলশ্রুতিতে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজ্যে বার্ষিক খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার (CAGR) হয়েছে সর্বোচ্চ ৩.৭৫ শতাংশ। কৃষিতে এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তৃতীয় ক্যাটাগরীভুক্ত সমস্ত রাজ্যের মধ্যে এক মিলিয়ন টনের কম খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ত্রিপুরাকে ২০১০-১১ সালে 'কৃষি কর্ষন' পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

রাজ্য সরকার সব সময়ই কৃষির উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন। কৃষিক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই সময়ে বিশেষভাবে কৃষি পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা হয়েছে যা নীচের টেবিলে দেখা যাবে :

ক্রমিক নং	বিষয়	একক	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	হিমঘরের সংখ্যা					
	i) সরকারি	সংখ্যা	০	০	১	৭
	ii) বেসরকারি	সংখ্যা	০	০	১	৪
	মোট	সংখ্যা	০	০	২	১১*
২.	হিমঘরের ফসল মজুত ক্ষমতা					
	i) সরকারি	এম টি	০	০	১০০০	১৪০০০
	ii) বেসরকারি	এম টি	০	০	২০০০	৩৬৫০০
	মোট	এম টি	০	০	৩০০০	৫০৫০০
৩.	মৃত্তিকা পরীক্ষাগার					
	i) স্থির	সংখ্যা	১	১	২	২
	ii) ভ্রাম্যমাণ	সংখ্যা	০	০	০	৪
৪.	বার্ষিক মাটির নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা	সংখ্যা	৩০০০	৩৫৭১	৫৪৯৪	১২৮৩৬
৫.	এস.এ.অফিসের সংখ্যা	সংখ্যা	০	১০	১৭	২২
৬.	কৃষি সেক্টর অফিসের সংখ্যা	সংখ্যা	০	০	০	৭৯
৭.	বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র	সংখ্যা	০	০	০	৬
৮.	আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত বীজ সংরক্ষণাগার	সংখ্যা	০	০	০	১
৯.	জীবাণুসার উৎপাদন কেন্দ্র	সংখ্যা	০	০	১	৬
১০.	জৈবিক পদ্ধতিতে জীবাণু নিয়ন্ত্রক উৎপাদন পরীক্ষাগার	সংখ্যা	০	০	১	১
১১.	কৃষি সামগ্রী পরীক্ষাগার	সংখ্যা	০	০	০	১

* ৬০০০ এম টি ক্ষমতা সম্পন্ন আরো ৪টি হিমঘর নির্মীয়মাণ।

কৃষিজ উৎপাদনে উন্নয়ন ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে সরকারের বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : জলসেচ সেবিত এলাকা সম্প্রসারণ, শ্রী (সিস্টেম অফ রাইস ইন্টেন্সিফিকেশন-SRI) পদ্ধতির প্রয়োগ, উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান বীজের প্রচলন এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান বীজের পরিবর্তনের হার লক্ষ্যমাত্রার ৩৩ শতাংশে পৌঁছানো, সংকর জাতের ধানের ব্যবহার, রাসায়নিক সার সহ জীবাণু সারের ব্যবহার, কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য কিষান ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি) প্রকল্পের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

সেচ সম্প্রসারণে বিশেষ উদ্যোগের ফলে রাজ্যে সেচ সেবিত জমির পরিমাণ বেড়েছে। ত্রিপুরায় মোট সেচযোগ্য জমির পরিমাণ হচ্ছে ১,১৭,০০০ হেক্টর (মোট কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ২,৫৫,৪৮৫ হেক্টর)। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ১,১০,৫২৪ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। এই সময়ে জল সেচের অগ্রগতির চিত্র নীচের টেবিলে দেওয়া হল :

১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১,৯৫৬	৪,৩৯৩	৪০,৩৮৩	১,১০,৫২৪

এ সমস্ত উদ্যোগের ফলে রাজ্যের কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নে সাফল্য আসতে শুরু করে। ১৯৭২ থেকে উন্নয়নের এক চিত্র নীচের টেবিলে দেওয়া হল :

ক্রমিক নং	বিষয়	একক	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	ফসল চাষের মোট এলাকা	হেক্টর	৩,৭৭,০০০	৩,৯২,০০০	৪,৮৫,০০০	৪,৭২,৪৯৪
২.	নীট এলাকা	হেক্টর	২,৪২,৫০০	২,৪৪,০০০	২,৮০,০০০	২,৫৫,৪৮৫
৩.	শস্য নিবিড়তা	% (শতাংশ)	১৫৫	১৬১	১৭৩	১৮৫
৪.	খাদ্যশস্য উৎপাদন এলাকা	হেক্টর	২,৮০,৭৪৬	৩,১২,১০৩	২,৭১,৬৯৫	২,৭৮,৫৯৮
৫.	খাদ্যশস্য উৎপাদন	এম.টি	২,৭৩,০৭৯	৩,৭৫,৩৪৮	৫,৪৭,৪৬০	৭,২৯,৯০৩
৬.	খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা	কেজি/হে.	৯৭৩	১,২০৩	২০১৫	২,৬২০
৭.	ধান উৎপাদন	এম.টি. /হে.	২,৭০,৮৪০	৩,৬৩,২৪০	৫,৩৫,৮৪০	৭,১৮,৩০৪
৮.	ধানের উৎপাদনশীলতা	কে.জি./হে.	৯৭৮	১,২০১	২,০৭৯	২,৭০০
৯.	শ্রীপদ্ধতিতে ধান চাষের এলাকা	হেক্টর	০	০	০	৮৬,৬৩০
১০.	উচ্চফলনশীল ধান চাষের এলাকা	হেক্টর	২৫৬৬০	১,১৬,০৬০	২,২০,০৫৫	২,৪০,০৬১
১১.	সংকর প্রজাতির ধান চাষের এলাকা	হেক্টর	০	০	০	৯,৬১২
১২.	উচ্চ ফলনশীল শংসিত বীজ উৎপাদন	এম.টি.	০	০	২৮	৪৫০০
১৩.	উচ্চফলনশীল বীজ পরিবর্তন (ধান)	% (শতাংশ)	উল্লেখ্য নয়	উল্লেখ্য নয়	২.৮	৩৩
১৪.	রাসায়নিক সার ব্যবহার (এন.পি.কে.)	কেজি/হে.	০	০	২৫	৫৫
১৫.	জীবাণুসার উৎপাদন	এম.টি.	০	০	১.৪	১৫০০
১৬.	কিষান ক্রেডিট কার্ড বিতরণ	সংখ্যা	০	০	০	২,৯৯,৮২৯ (ক্রমপুঞ্জিত)

উদ্যান

উপযুক্ত কৃষি জলবায়ুর অবস্থান, উর্বর জমি, নাতিশীতোষ্ণ (সাবট্রপিক্যাল) আর্দ্র আবহাওয়া সহ পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের দরুন ত্রিপুরায় উদ্যান ফসলের উন্নয়নে এক বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার বিষয়টিকে উপলব্ধি করে উদ্যান ফসলের উন্নয়নে দশবর্ষীয় এক পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০০২-২০১২) গ্রহণ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল অতিরিক্ত ২১,৬০৭ হেক্টর জমি উদ্যান ফসল চাষের আওতায় আনা। ৭২,১৫৩ হেক্টর থেকে বাড়িয়ে অতিরিক্ত এই জমি উদ্যান ফসল চাষের আওতায় আনার উদ্দেশ্য হল ফলের উৎপাদন ৩.০০ লক্ষ এম. টি. থেকে বাড়িয়ে ৬.০৫ লক্ষ এম.টি., সব্জীর উৎপাদন ৩.২৫ লক্ষ এম. টি. থেকে ৪.৩৮ লক্ষ এম.টি., বাগিচা ফসলের উৎপাদন ০.০৯ লক্ষ এম.টি থেকে ০.২২ লক্ষ এম.টি., মশলা জাতীয় পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন ০.১৭ লক্ষ এম.টি. থেকে ০.২০ লক্ষ এম.টি-তে নিয়ে আসা। ২০১১-২০১২ বর্ষে পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনায় যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল তা ইতিমধ্যেই ২০১১-১২ সময়কালে অর্জিত হয়েছে। ২০১১-১২ সময়কালে ৬.৪৬ লক্ষ এম. টি. ফল, ৫.৫১ লক্ষ এম. টি. সব্জী, ০.৪৬ লক্ষ এম.টি. বাগিচা ফসল এবং ০.২৯ লক্ষ এম. টি. মশলা জাতীয় পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। গত কয়েক বছরে ফুলচাষ এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কার্যক্রম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

উন্নতমানের চারা উৎপাদনের জন্য এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রকম ফসলের ৪৭টি নার্সারি গঠিত হয়েছে। উৎপাদন বেড়েছে আম, কলা, পেঁপে ও আনারসের। ক্লাস্টারের মাধ্যমে অসংখ্য গুচ্ছ বাগিচার উন্নয়ন হয়েছে। সব্জী উৎপাদনেও বিশাল অগ্রগতি হয়েছে। কিছু বিদেশি ও মরশুম বহির্ভূত সব্জী যেমন, ক্যাপসিকাম, গাজর, গ্রীষ্মকালীন বাঁধাকপি, গ্রীষ্মকালীন টমেটো, পটল, ওলকপি ও স্কোয়াশ এবং বাণিজ্যিক ফুলের যেমন অ্যান্থুরিয়াম, অর্কিড, জারবেরা (সুরক্ষিত ভাবে) খোলা জমিতে গাঁদা, রজনীগন্ধা, গ্যাডিওলাসের উৎপাদন বেড়েছে।

মৃত্তিকা সংরক্ষণে ৯২,১৭১ হেক্টর, ৪৫,০৯১ হেক্টর এবং ২৩,৬৭৪ হেক্টর এলাকাকে এ পর্যন্ত যথাক্রমে এন ডাব্লিউ ডি পি আর এ,ডাব্লিউ ডি পি এস সি এ, আই ডাব্লিউ ডি পি প্রকল্পের আওতায় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

নার্সারি সৃষ্টি ও বাণিজ্যিক ভাবে ফুল চাষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বেকার যুবকদের এখন বেশী করে আকৃষ্ট করছে। ১৯৭২ থেকে উদ্যান ও মৃত্তিকা সংরক্ষণে যে উন্নতি হয়েছে তা নীচের টেবিলে তুলে ধরা হল:

ক্রমিক নং	বিষয়	একক	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	ফল					
	ক) এলাকা	হেক্টর	৯৩০০	১২৭৪০	২৪২৩০	৫৪৫০০
	খ) উৎপাদন	এম.টি.	৭২,২০০	১,৩৯,৪২০	৩,৬৩,৫২০	৬,৪৬,০০০
	গ) উৎপাদনশীলতা	এম.টি/হে.	৭.৭৬	১০.৯৪	১৫.০০	১১.৮৫
২.	বাগিচা ফসল					
	ক) এলাকা	হেক্টর	৩১৩০	৪৩১০	৮২৬০	১৭০০০
	খ) উৎপাদন	এম.টি.	৪৭৫০	৬৭৯০	১৩৬২০	৩৯,০০০
	গ) উৎপাদনশীলতা	এম.টি./হে.	১.৫১	১.৫৭	১.৬৪	২.২৯
৩.	মশলা চাষ					
	ক) এলাকা	হেক্টর	১০০০	১৬৯০	৪০০০	৫৮৫০
	খ) উৎপাদন	এম.টি.	৫০০০	৭০৭০	১৩৯৭০	২৯০০০
	গ) উৎপাদনশীলতা	এম .টি /হে.	৫.০০	৪.১৮	৩.৪৯	৪.৯৫
৪.	সব্জী (আলু সহ)					
	ক) এলাকা	হেক্টর	৬,০০০	৭,৫৯০	১২,৯০০	৪১,১০০
	খ) উৎপাদন	এম.টি./হে.	৩০,০০০	৫২,৫৬০	১২,৭,৭৮০	৫,৫১,০০০
	গ) উৎপাদনশীলতা	এম.টি/হে.	৫.০০	৬.৯২	৯.৯১	১৩.৪০
৫.	ফুল					
	ক) এলাকা	হেক্টর	০	০	০	২৫০
	খ) উৎপাদন	এম.টি.	০	০	০	১২৫০
	গ) উৎপাদনশীলতা	এম.টি./হে.	০	০	০	৫.১
৬.	জলসম্পদ সৃষ্টি					
	ক) কমিউনিটি ট্যাঙ্ক	সংখ্যা	০	০	০	২২৬৬
	খ) টিউবওয়েল	সংখ্যা	০	০	০	১৮৪৪
৭.	কৃষিকাজে জল ব্যবস্থাপনা					
	ক) ড্রিপ ইরিগেশন	১০০ বর্গ মি.	০	০	০	৬১৫
	খ) কম খরচে গ্রীন হাউস	৫০০ বর্গ মি.	০	০	০	১৭০৩
	গ) হাইটেক গ্রীন হাউস	৫০০ বর্গ মি.	০	০	০	৭৬
	ঘ) শেড নেট	৫০০ বর্গ মি.	০	০	০	১৮৪৯
	ঙ) খামারে কৃষি যন্ত্রপাতি রাখার ঘর	সংখ্যা	০	০	০	৩০৬

৮.	জৈব চাষ পদ্ধতি					
	ক) ভার্মি সার ইউনিট	সংখ্যা	০	০	০	১৯০৭
	খ) জৈব চাষে উৎসাহ	সংখ্যা	০	০	০	১১১১
৯.	কৃষিযন্ত্র উপকরণ					
	ক) মনুষ্যচালিত	সংখ্যা	০	০	০	৫৩৬৬
	খ) পাওয়ার টিলার	সংখ্যা	০	০	০	১৭৮৫
	গ) ডিজেল ইঞ্জিন	সংখ্যা	০	০	০	৬৯৪৫
	ঘ) বিদ্যুৎচালিত	সংখ্যা	০	০	০	১০৮২
১০.	নার্সারি গঠন বেসরকারি ক্ষেত্র					
	ক) বৃহৎ নার্সারি	সংখ্যা	০	০	০	১০
	খ) ক্ষুদ্র নার্সারি	সংখ্যা	০	০	০	৪৫
	সরকারি ক্ষেত্র					
	ক) বৃহৎ নার্সারি	সংখ্যা	০	০	০	১০
	খ) ক্ষুদ্র নার্সারি	সংখ্যা	০	০	০	৩৭
	গ) টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি	সংখ্যা	০	০	০	০১
	ঘ) লিফ অ্যানালাইসিস্ ল্যাব.	সংখ্যা	০	০	০	০১
১১.	কৃষক প্রশিক্ষণ					
	ক) রাজ্যের ভেতরে	সংখ্যা	০	০	৮৫০	২৭৩০২
	খ) রাজ্যের বাইরে	সংখ্যা	০	০	০	৪৮৯৭

প্রাণী সম্পদ বিকাশ

গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহে প্রাণী সম্পদ ক্ষেত্রটি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাছাড়া গ্রামীণ মানুষের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও প্রাণী সম্পদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্বেও প্রাণী সম্পদ বিকাশে ত্রিপুরায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, বিশেষ করে ডিম ও মাংস উৎপাদনে। ২০১১-১২ সময়কালে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন হয়েছে যথাক্রমে ১,১০,৩০০ এম.টি., ২৫,০০০ এম.টি. এবং ১৬.৫০ কোটি। সরকারি প্রাণী সম্পদ বিকাশের পরিষেবা জন সাধারণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে ১৫টি ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ৫৯টি ডিসপেনসারি, ১১টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র এবং ৪২৬টি সাব সেন্টারের মাধ্যমে।

ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই সরকার মাংসের যোগানের জন্য বহির্রাজ্যের উপর নির্ভরতা কমাতে চাইছে। ডিম উৎপাদন ১৯৯৭-৯৮ থেকে ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিম বর্তমানে রাজ্যে বছরে মাথাপিছু ৪৩টি পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে জাতীয় গড় বছরে ৫৩টি (২০১০-১১)। সম্প্রতি রাজ্যে প্রতি মাসে প্রায় ১০ লক্ষ ব্রয়লার চিকসের উৎপাদন হচ্ছে। কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটিয়ে একদিনের ব্রয়লার চিকসের (DOBC) প্রয়োজনের প্রায় ৮০ শতাংশই রাজ্যের হ্যাচারিতে উৎপাদন হচ্ছে। অবশিষ্ট অংশের প্রয়োজন মেটানো হচ্ছে প্রতিবেশী রাজ্য থেকে আমদানি করে। যাই হোক দুধ উৎপাদনে রাজ্যের পারদর্শিতা আশানুরূপ নয়। রাজ্যে এখন দৈনিক মাথাপিছু ৭৯ গ্রাম দুধ পাওয়া যায়, যেখানে জাতীয় গড় হচ্ছে ২৮১ গ্রাম (২০১০- ১১)। দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যে সম্ভাব্য সমস্ত রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাণী সম্পদ বিকাশে রাজ্যে যে উন্নতি

ঘটেছে তা নীচের টেবিলে তুলে ধরা হল :

ক্র. নং	বিষয়	একক	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	মাংস উৎপাদন	এম. টি.	২৭৯৮	৪৩৬০	৫৯৭৫	২৫০০০
২.	ডিম উৎপাদন	কোটি	২.৬২	৫.২৬	১০.৮৬	১৬.৫০
৩.	দুধ উৎপাদন	এম. টি.	১৮,২১৯	৫৮,১৭৫	৭৬,৮১০	১,১০,৩০০
৪.	প্রাণী ও পাখী চিকিৎসা	লক্ষ	৩.৮৯	৫.৫৫	৭.৪	৫.৭
৫.	ভ্যাকসিনেশন	লক্ষ	২.৯৩	৪.১৮	৫.৫৮	৫৬.৫৪
৬.	কৃত্রিম প্রজনন	সংখ্যা	১২,১৪৫	৩৭,৯৬৮	৭১,৬২২	১,২৫,২৮০
৭.	সঙ্কর প্রজাতির গাভীর জন্ম	সংখ্যা	৩,৮৯৬	৯,৮৫৭	২৬,৯৬৬	৪৮,১৪৬
৮.	উন্নত প্রজাতির শূকর ছানার জন্ম	সংখ্যা	৭৮৫	১৫২১	৩৪১৬	৪৯০০
৯.	পশু চিকিৎসালয়	সংখ্যা	০১	০৪	০৯	১৫
১০.	ডিসপেন্সারি	সংখ্যা	১৬	২৫	৪৪	৫৯
১১.	উপচিকিৎসাকেন্দ্র	সংখ্যা	৭৯	১৮৫	৩৪৪	৪২৬
১২.	রোগ নির্ণয় ল্যাবরেটরি	সংখ্যা	০১	০৩	০৩	০৪
১৩.	হাঁস/মোরগ প্রজনন কেন্দ্র	সংখ্যা	০৩	০৪	০৪	০৫
১৪.	শূকর/ ছাগল/ ঘোরগোম গাভী প্রজনন কেন্দ্র	সংখ্যা	০৬	০৭	১০	১১
১৫.	গবাদি প্রাণী খাদ্য উন্নয়ন কেন্দ্র	সংখ্যা	০২	০৩	০৫	০৭
১৬.	ব্লক ভিত্তিক ব্রুডার হাউস (BLBH)	সংখ্যা	০	০	০	৭৬

মৎস্য

ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ মানুষ তাদের দৈনন্দিন খাবারের তালিকায় মাছকে রাখেন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য হিসেবে। মৎস্য চাষের উন্নয়নে ১৯৯০ থেকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মৎস্য চাষের উন্নয়নের পাশাপাশি মাছের চারাপোনা উৎপাদনেও সাফল্য এসেছে। প্রধান প্রধান ভারতীয় কার্প ও চাইনীজ কার্প রাজ্যে খুবই জনপ্রিয়। ফলে বর্তমানে কার্প চারাপোনা উৎপাদনে ত্রিপুরা উদ্বৃত্ত রাজ্য।

দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে ত্রিপুরা একমাত্র স্থল বেষ্টিত রাজ্য যেখানে কৃত্রিম সামুদ্রিক জলে বাণিজ্যিক ভাবে বড় জাতের চিংড়ি জায়েন্ট ফ্রেশ ওয়াটার প্রন চাষ হচ্ছে। পাশাপাশি চিংড়ি উৎপাদনে পলি-কালচারও হচ্ছে।

২০০৪ সালে মাছ উৎপাদনে রাজ্যকে ২০১১-১২ সালের মধ্যে স্বয়ম্ভর করতে অর্থাৎ বছরে মাথা পিছু ১৩ কেজি মাছের যোগান দিতে একটি পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পরিকল্পনা রূপায়ণের সাফল্যের প্রেক্ষিতে ২০১০-১১ সালেই মাথা পিছু বছরে ১৩ কেজি মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় এবং বছরে মাথা পিছু ১৪.১২ কেজি মৎস্য উৎপাদন হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে মৎস্য চাষের সমস্ত উৎসকে বিজ্ঞানসম্মত মৎস্য চাষের আওতায় আনা, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে 'এরোটার' যন্ত্র ব্যবহার, চিংড়ি চাষ, ডম্বুর জলাশয়ে চিংড়ি ও চিতলের পোনা সংরক্ষণ, মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, মৎস্যখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ল্যাবরেটরি, মৎস্য চাষ উৎপাদনে উদ্যোগীদের এবং মহিলা ও উপজাতিদের যুক্ত করে পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে। ২০০৮ সালে মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত ২০তম অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস অব জুলজিতে ত্রিপুরা সেরা উন্নত রাজ্য হিসেবে পুরস্কৃত হয়।

বিগত বছরগুলিতে রাজ্যে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। রাজ্যে মাছের ব্যবহারও দ্রুত বাড়ছে। প্রয়োজন মেটানোর জন্য এখনও রাজ্যে বাংলাদেশ ও দেশের অন্যান্য অংশ থেকে মাছ আমদানি করা হলেও আমদানির পরিমাণও ক্রমশ কমছে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজ্যের লক্ষ্যমাত্রা হল বছরে মাথা পিছু মাছের উৎপাদন ১৯ কেজিতে নিয়ে যাওয়া। মৎস্য চাষের উন্নয়নে ১৯৭২ সাল থেকে রাজ্যে যে উন্নতি ঘটেছে তা নিচের টেবিলে দেওয়া হল :

ক্রমিক নং	বিষয়	একক	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	জল সম্পদ					
	ক) কালচার ওয়াটার	হেক্টর	৪৪১৪.০০	৫,৩০২.০০	১০,১৪০.৮০	২২৮২৯.০০*
	খ) অধিকৃত জলাশয়ে মৎস্যচাষ	হেক্টর	৫৫০০.০০	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০	৭৮৭৮.৭৬**
২.	মৎস্য উৎপাদন	এম. টি.	৫৬৮৪.০০	৬৪১৫.০০	১৩,৩৬৭.৬৮	৫৩০৮০.০০*
৩.	উৎপাদনশীলতা	কেজি/হেঃ	১২৪০.০০	১১৬৭.৩৭	১২৮০.০০	২৫০০.০০*
৪.	চারাপোনা উৎপাদন					
	ক) কার্প চারা পোনা	লক্ষ	৪০.০০	৬৪৯.৩৩	১,০৫০.১৫	৩৬৫০.১৮*
	খ) চিংড়ি পোনা	লক্ষ	০	০	০	৫.২০
	গ) পাবদা পোনা	লক্ষ	০	০	০	০.৭৩
৫.	মাছ ও চিংড়ির হ্যাচারি	সংখ্যা	০	০	০৬	২৯
৬.	মৎস্যচাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সংখ্যা	০	০	০২	০৯
৭.	মাটি ও জল পরীক্ষার ল্যাবরেটরি	সংখ্যা	০	০	০	২৭
৮.	মিনি গবেষণা ল্যাবরেটরি	সংখ্যা	০	০	০	০২
৯.	মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানা	সংখ্যা	০	০	০	১৬
১০.	মৎস্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ল্যাবরেটরি	সংখ্যা	০	০	০	০৩

১১.	কার্যকরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত মৎস্য চাষী	সংখ্যা	০	০	৮৫০	৫৩৫৪
১২.	মৎস্য দপ্তরের সার্কেল অফিস	সংখ্যা	০	১২৫	২৬৬	৩৯৮
১৩.	পাট্টা প্রাপ্তদের জলাশয়ে বিজ্ঞান সম্মত মৎস্যচাষ	হেক্টর	০	০	০	৬১৮.৬৮
১৪.	ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী জলাশয়ে মৎস্যচাষ	সংখ্যা	০	০	০	৮৫৮
১৫.	বৃহৎ জলাশয়ে পেন কালচার	হেক্টর	০	০	০	৩২.৫৪
১৬.	বৃহৎ জলাশয়ে নিবিড় মৎস্য সম্প্রসারণ	হেক্টর	০	০	০	২৯১.২৬

* প্রভিশন্যাল

** ডম্বুর জলাশয় ও রুদ্রিজলার জল শুকিয়ে যাওয়ায় রাজ্যে মুক্ত জলাশয় এলাকা হ্রাস পেয়েছে।

বন

শুধুমাত্র পরিবেশ সুরক্ষার দিক থেকেই নয়, মানুষের বিশেষ করে উপজাতি এবং বনবাসীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্য সরকার বন সংক্রান্ত কার্যাবলীকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরা হল :

- রাজ্যে মূল বনাঞ্চলের আয়তন ১৯৮৭ সালে (প্রথমবার নিরূপণ করা) ছিল ৫,৭৪৩ বর্গকিলোমিটার। ২০০৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭,৯৭৭ বর্গকিলোমিটার-এ।
- বন সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের ব্যাপারে অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতি প্রথা চালু করার ব্যাপারে ত্রিপুরা পথ প্রদর্শক রাজ্যগুলির মধ্যে একটি। রাজ্য ১৯৬৩ সালে রাবারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত ৫০,০০০ পরিবারকে যাদের অধিকাংশই উপজাতি (এদের একটি বড় অংশ জুমিয়া পরিবার থেকে এসেছে) রাবার চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে। ত্রিপুরা হচ্ছে এই মুহূর্তে কেরালার পরই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাবার উৎপাদক রাজ্য।

- সমবায় বনায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে রাজ্যে বননীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজ্যের বাঁশ নীতিও প্রণয়ন করা হয়েছে সাধারণ মানুষের স্বার্থে এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দিকে নজর রেখে।

- সিপাহীজলা, তৃষ্ণা, গোমতী এবং রৌয়া নামে চারটি অভয়ারণ্য স্থাপন করা হয়েছে। ইকো-ট্যুরিজমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এবং ইন্দো-জার্মান ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (আইজিডিসি) নামে দুটি বিদেশী আর্থিক সহায়তায় রূপায়িত প্রজেক্ট গ্রামের দরিদ্র অংশের মানুষের জন্য জীবিকা নির্বাহের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশের উন্নতি সাধনের জন্য ২০০৭-২০০৮ সাল থেকে হাতে নেয়া হয়েছে।

বনায়নের ক্ষেত্রে ১৯৭২ সাল থেকে যে উন্নয়ন ঘটেছে তা নীচে বিস্তৃতভাবে দেয়া হল —

ক্রমিক নং	বিষয়	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	**প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা**				
	বনায়ন করা (হেক্টর)	৩০,৯১৬	৫৫,৮৮৫	২,২৫,৭২০	২,৭৮,৪০৭
	বাঁশ চাষ (হেক্টর)	০.০০	৪৮৫	৮৯৩	৪৫,৯১৫
	ঔষধিবৃক্ষ চাষ (হেক্টর)	০.০০	০.০০	০.০০	৩,৪১৭
	ব্যক্তিগত জায়গায় সামাজিক বনায়ন	০.০০	০.০০	১৭,০৬২	২৪,১৫০
	সামাজিক বনায়ন/অঙ্গনবন প্রকল্পের আওতায় আসা পরিবার (সংখ্যায়)	০.০০	০.০০	৫২,৩৬৬	৭৯,২৫৭
২.	**বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ**				
	জাতীয় উদ্যান/অভয়ারণ্য সংখ্যা	০	০	৪	৬
৩.	**উন্নয়নের কাজে জনগণের অংশগ্রহণ**				
	যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (জে এফ এম সির সংখ্যা)	০	০	০১	৯৪৬
	জে এফ এম সি গুলির প্রকল্প এলাকা (হে.)	০	০	১০০	২,৬০,২১১
	স্বসহায়ক গোষ্ঠীর গঠন	০	০	০	২,০২১
৪.	**সোস্যাল ইন্টারফেস (আর্থ সামাজিক এবং জীবিকার উন্নয়ন উপজাতি জুমিয়াদের সামাজিক অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য গুচ্ছ বনগ্রামের গঠন —**				
	গুচ্ছ গ্রামের সংখ্যা	০	০	০	২১
	গুচ্ছ গ্রামে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা	০	০	০	৩,৩৩০
	বনগ্রামের সংখ্যা	০	০	০	৬২
	বনগ্রামে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা	০	০	০	১,৫০৮
	নয়াবসতি গ্রামে সুযোগ সুবিধা প্রদান পানীয় জল (সংখ্যায়)	০	০	০	৮৬
	বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (সংখ্যা)	০	০	০	৭৮
	ইন্দিরা আবাস যোজনার আওতায় ঘর	০	০	০	১,৬৭৭
	ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা : বাঁশ এবং অন্যান্য বিষয়ে মানুষকে প্রশিক্ষণের সংখ্যা	০	০	০	৮,০৯৮
	মাছ, হাঁস চাষের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের জন্য জলাধার/বাঁধ নির্মাণ (হেক্টর এলাকা)	০	০	০	৩,২৭৪
৫.	**রিক্রিয়েশন ফরেষ্ট্রি এবং ইকো সচেতনতা**				
	সংরক্ষণের জন্য ইকো পার্ক, ইকো ট্যুরিজম এবং সচেতনতা	০	০	০	২৪
৬.	**শ্রমদিবস সৃষ্টি (লক্ষ)**	০	০	৩২৫.৫৫	৫৭৫.৬৬

বিদেশী সহায়তা নির্ভর প্রকল্প

রাজ্য সরকারের বন দপ্তর এছাড়াও দুটি বিদেশী সহায়তা নির্ভর প্রকল্প রূপায়ণ করছে। এই প্রকল্পগুলিতে উন্নয়নের চিত্র এখানে তুলে ধরা হল :

ক) জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) প্রকল্প

ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চলের উর্বরতা সাধনের মাধ্যমে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বনের পুনর্গঠন এবং গ্রামীণ দরিদ্র অংশের মানুষের জীবিকা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ সাল থেকে এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করা হচ্ছে। ১৬টি পুনর্বিন্যস্ত গুচ্ছ বন গ্রামকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এখন পর্যন্ত যে সমস্ত কাজকর্ম করা হয়েছে তা হচ্ছে —

ক্রমিক নং	বিষয়	ইউনিট	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
				২০০৭-০৮	২০১১-১২
১.	যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন	সংখ্যা	৪৫৬	৫৩	৪৩৯
২.	বনায়ন	হেক্টর	৫৫,০০০	০	১১,৪৫৮

খ) ইন্দো-জার্মান ডেভেলাপমেন্ট কো-অপারেশন (আই জি ডি সি) প্রকল্প

জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রজেক্টের কাজকর্ম রূপায়ণের জন্য প্রকল্পের গ্রামের চিহ্নিতকরণ, ভিলেজ ডেভেলাপমেন্ট প্ল্যানিং ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি (ভি ডি পি আই সি) গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে ২০০৮-০৯ সাল থেকে এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। ২০১১-১২ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৪৭টি ভি ডি পি আই সি , ৩৮৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ৮টি ব্যবসায় ইউনিট গঠন করা হয়েছে। ২,৩৬৪ হেক্টর বনায়ন হয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য

ত্রিপুরায় শিল্পায়নের কাজ ধীরে ধীরে গতি পাচ্ছে। এই মুহূর্তে ত্রিপুরা দুটি বৃহৎ শিল্প ইউনিট (বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বাদ দিয়ে) রয়েছে। এর একটি হচ্ছে স্টিল কোল্ড রোলিং মিল (জি সি আই শিট উৎপাদন করে থাকে) এবং অন্যটি একটি রাবার থ্রেড ইউনিট। একটি হিমঘর (২৫,০০০ মেট্রিকটন ক্ষমতা সম্পন্ন), একটি টি এম টি বার / রড / ফ্ল্যাটস ইউনিট, একটি সিমেন্ট প্ল্যান্ট, কয়েকটি চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মতো মাঝারি ধরনের কিছু শিল্প কারখানা রয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি ছোট এবং ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। কেন্দ্রীয় মাইক্রো, স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস (এম এস এম ই) মন্ত্রকের ২০০৭ সালে করা এক সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরায় নথীভুক্ত ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি ধরনের শিল্প কারখানার সংখ্যা ছিল ১২৫৩টি। এর পর থেকে ১০৩৫টি ইউনিটের নাম নথীভুক্ত করা হয়েছে। ফলে নথীভুক্ত ইউনিটের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২,২৮৮টি (৩১.০৩.২০১২ পর্যন্ত)।

শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭০০ কোটি টাকার মতো। এই ক্ষেত্রে ২০,০০০-র মতো যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। শিল্প ক্ষেত্রের মোট উৎপাদনের মূল্য আসছে ৭০০ কোটি টাকার মতো। রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জি এস ডি পি) (২০১০-১১) ২৭.৫ শতাংশ আসছে এই ক্ষেত্র থেকে। বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য দারুণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাণিজ্যের পরিমাণ সব মিলিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩০.৬০ কোটি টাকা (২০১১-১২), যা একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ছয় গুণ বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সামনে রেখে রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, একটি ফুড পার্ক, একটি রাবার পার্ক এবং একটি এক্সপোর্ট প্রমোশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক (ই পি আই পি)-র আদলে বোধজংনগরে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। একটি ব্যাম্বো পার্কও গড়ে তোলা হচ্ছে। এর অতিরিক্ত রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আরো ৬টি শিল্প এলাকা রয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ আরো বাড়ানোর জন্য ল্যান্ড কাস্টমস্ স্টেশনগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি নতুন আই টি আই স্থাপন করা হচ্ছে এবং বর্তমান আই টি আইগুলির উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। স্ব-রোজগারী কাজকর্ম শুরু করার জন্য যুবক-যুবতীদের সহায়তা করা হচ্ছে। রাবার, বাঁশ, ফলজাত দ্রব্য, চা, প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো স্থানীয়ভাবে যে সব সম্পদ পাওয়া যাচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে শিল্প স্থাপন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ১৯৭২ সালের তুলনায় ২০১২ সালের দপ্তরের সাফল্য নীচে তুলে ধরা হল :

ক্র. নং	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	স্ব-রোজগার সহায়তার সংখ্যা	-	-	৬৯৫	৩,২২৬
২.	শিল্পের পরিকাঠামো মোট জমি আওতায় এসেছে (একর)	৭৬.৩৫	৭৬.৩৫	১৪০.২৩	৭২৮.৩৩
৩.	বিদেশী বাণিজ্য (কোটি টাকা)	-	-	১৫.৪৬	৩৩০.৬০
৪.	আই টি আই -র সংখ্যা	২	২	৪	৮
৫.	গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র				
	• খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (কোটি টাকার টার্ন ওভার)	-	-	১.০০	৬৮.৩৪
	• হস্ততাঁত (ক্লাস্টারে তাঁতীর সংখ্যা)	৩,২০০	৫,৩০০	৮,৬৪৫	১৯,২৬৪
	• হস্তকারু (কোটি টাকার টার্নওভার)	০.০৫	০.০৫	৬.০০	২৪.০২
	• সিল্কের সুতা উৎপাদন (কেজি)	-	-	৮০০	১,৯৭০
	• রাজ্যে রাবারের ব্যবহার (মেট্রিক টন)	-	-	১০০	৩,০০০
	• বাঁশ (কোটি টাকার টার্নওভার)	-	-	-	১০৭.২২

পর্যটন

পর্যটন এখন অর্থনীতির একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ত্রিপুরা এবং অন্যান্য রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবার ফলে পর্যটন অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ ও বৌদ্ধ ধর্মের স্থাপত্য, বন এবং বন্য জন্তু, চিরাচরিত হস্তশিল্প, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভরপুর ত্রিপুরায় পর্যটনের বিকাশে দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে শান্তির পরিবেশ পুনরায় স্থাপিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণে রাজ্যের পর্যটন বিকশিত হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে দিনদিন আভ্যন্তরীণ এবং বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে।

রাজ্যের পর্যটনকে বিকশিত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার একটি সুসংহত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে থাকার সুবন্দোবস্ত করা, বর্তমান পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং পর্যটনের উপাদানে

বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এজন্য ডেস্টিনেশন ডেভেলাপমেন্ট, সার্কিট ডেভেলাপমেন্ট, রুর‍্যাল ট্যুরিজম প্রজেক্টের মতো কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে রাজ্যে পর্যটনকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ১৯৮৭ সাল থেকেই তা পরিগণিত হয়ে আসছে। রাজ্যের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পর্যটনের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে পেশাদারিত্ব আনতে এবং পর্যটন ক্ষেত্রকে আরো বিকশিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম গঠন করেছে। ০৩.০৬.২০০৯ তারিখে কোম্পানীজ অ্যাক্ট অনুযায়ী নিগমকে নথীভুক্ত করা হয়েছে।

পর্যটন আবাস, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি নির্মাণের মতো মৌলিক পরিকাঠামো উন্নয়নে পর্যটন উন্নয়ন নিগম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। বর্তমানে কর্পোরেশন ৩৩টি পর্যটক আবাস, ১০টি ক্যাফেটেরিয়া, ১৫টি সুলভ টয়লেট চালাচ্ছে। আখাউড়া চেক পোস্ট এন্ড ইন্টারন্যাশনাল বাস টার্মিনাসে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এর অতিরিক্ত চন্দ্রপুর আই এস বি টিতে ওয়ে সাইড অ্যামেনেটি স্থাপন করা হয়েছে এন্ড সোসাইটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আনন্দনগর আগরতলায় হোটেল ম্যানেজমেন্টের ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। এটি স্থানীয় যুবক-যুবতীদের পর্যটন পরিষেবার ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব আনতে বিরাট ভূমিকা নেবে। পর্যটন ক্ষেত্রে ১৯৭২ সাল থেকে যে সমস্ত উন্নয়ন ঘটেছে তা নীচে দেওয়া হল :

ক্রমিক নং	বিষয়	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	পর্যটন কেন্দ্রের সংখ্যা	-	-	১৭	২৩
২.	যাত্রী আবাস/ যাত্রী নিবাস স্থাপন	-	-	০৯	৩৩
৩.	আর্থিক বছরে পর্যটক আগমনের গড় সংখ্যা				
	ক) বিদেশী পর্যটক	-	-	১,১৯৪	৭,৩২৯
	খ) আভ্যন্তরীণ পর্যটক	-	-	১,৩৭,৮০৪	৪,০৪,৬৯৭

জনগণের জন্য ন্যূনতম পরিষেবা

ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের মধ্যে সরকারী জমি বণ্টন

ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ এবং ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব সংশোধনী রুলস্ ১৯৬১ অনুসারে রাজ্যে ভূমি বণ্টন ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কার্যাবলী কার্যকর হচ্ছে। রাজ্য সরকার উক্ত আইনের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় সুযোগ অনুসারে সরকারের আওতাধীন ছোটো ছোটো জায়গায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের নিজস্ব বাড়িঘর নির্মাণের জন্য অর্থনৈতিক সুবিধা দিচ্ছেন যাতে তারা মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারেন। ১৯৭২ সাল

থেকেই ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের প্রক্রিয়াটি নিম্নে একটি টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হল :

ক্রমিক নং	বিষয়	একক	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	সুবিধাভোগীদের সংখ্যা	সংখ্যায়	৪২,৪৬১	৪৪,৮৯২	৭৫,৭৬০	১,৮৬,৫৩৪
২.	ভূমি বন্দোবস্তের এলাকা	একর হিসাবে	৩৯,৫০৭	৭১,৭৭১	৯৭,২৩৩	২,২৭,০৫৩

আবাসন

যে কোনো নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে আশ্রয় এবং এটি মানুষের জীবনের গুণমানকে নির্দেশিত করে। একজন আশ্রয়হীন লোকের কাছে তাঁর মাথার উপরের ছাদ যেমন একটি প্রয়োজনীয় সম্পদ তেমনি তাঁর মানসিক এবং শারীরিক উন্নতির সহায়ক। প্রকৃতপক্ষে, দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি লক্ষ্যই হচ্ছে আশ্রয়হীনতার সংখ্যার সমূলে হ্রাস করা। রাজ্য সরকার এই বিষয়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

রাজ্যে গ্রামীণ এলাকায় গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণের প্রক্রিয়াটির অগ্রগতি নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	বিষয়	একক	১৯৯৬ পর্যন্ত	১৯৯৭-৯৮	২০১২
১.	ইন্দিরা আবাস যোজনায় গৃহ নির্মাণের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যায়	—	১৯,১৬১	২,০৫,৮২৭

পানীয় জল সরবরাহ

রাজ্যসরকার রাজ্যের সর্বত্র নিরাপদ এবং পর্যাপ্ত পানীয় জল প্রতিটি জনবসতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে দায়বদ্ধ। এই জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে মাটির উপরে, নীচে এবং বৃষ্টির জলকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে জল পরিশোধন প্রকল্প, গভীর নলকূপ, ছোট অগভীর নলকূপ, সাধারণ হ্যান্ডপাম্প, মার্ক-টু/থ্রি, আর. সি. সি. কুয়ো, স্যানিটারি ওয়েল, ম্যাসন্‌রি ওয়েল এবং যৌথ

সুবিধাভোগীদের জন্য বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে সংরক্ষণের কাঠামো তৈরি করা ইত্যাদি। ভূ-গর্ভস্থ জলে আয়রনের মাত্রাতিরিক্ত আধিক্য রাজ্যের জল সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। রাজ্য সরকার এর মোকাবেলায় গভীর ও অগভীর নলকূপ সমূহে লৌহমুক্ত জল সরবরাহ প্রকল্প নির্মাণে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ১৯৭২ সাল থেকে পানীয় জলের উৎস তৈরির অগ্রগতির একটি রূপরেখা তথ্যভিত্তিক টেবিলের মাধ্যমে নীচে দেখানো হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	একক	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	গভীর নলকূপ	সংখ্যা	০২	২৭	৪৪০	১২৭২
২.	অগভীর নলকূপ	,,	নেই	নেই	নেই	১৪০৯
৩.	লৌহ মুক্ত প্রকল্প	,,	,,	,,	২৭	৫৭৬
৪.	ওভারহেড জলাধার	,,	০২	০৩	১৮	১২৭
৫.	জল পরিশোধন প্রকল্প	সংখ্যা	০১	০১	০২	৩১
৬.	কার্যকর স্থানীয় জলের উৎস	সংখ্যা	—	—	২৩,৪২৯	২৫,১৩৭
৭.	পাইপ লাইন	কিমি	—	—	২৬৫৬	৮৮৬৬.৭৯
৮.	জল পরীক্ষাগার	সংখ্যা	০১	০১	০২	২৩

স্বাস্থ্যবিধি

জীবনের মানোন্নয়ন এবং মানব সম্পদের বিকাশের অন্যতম মৌলিক নির্দেশক হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি।

রাজ্যসরকার, গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ, প্রতিটি বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র সহ যৌথ ব্যবহার উপযোগী স্বাস্থ্য বিধির সুযোগ পৌঁছে দেবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসের উপরও বিশেষ জনচেতনা সৃষ্টি করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এর ফলে ডায়রিয়া, কলেরাসহ জলবাহিত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে ধারাবাহিক কর্মসূচি ও উদ্যোগের ফলে, ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে দেশের গুটি কয়েক রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরাই হচ্ছে একমাত্র রাজ্য যেখানে গ্রামীণ জনগণ সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যবিধির আওতায় রয়েছেন এবং ৭৮ শতাংশ গ্রামীণ জনগণ বিজ্ঞানসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করছেন সেই সময়ে। সার্বিক স্বাস্থ্যবিধির আওতায় গোটা রাজ্যই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধির গুণগত সুবিধাগুলি প্রতিটি বাড়ি, বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে পৌঁছে দেবার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে শুখা মরশুমেও ডায়রিয়া রোগের প্রকোপ মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস যেমন খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, শৌচকর্মের পর হাত ধোয়া, জলের নিরাপদ ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে অগ্রগতির একটি তালিকা প্রদত্ত হল :

ক্রমিক নং	বিষয়	একক সংখ্যা	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	এ পি এল ও বি পি এল ভুক্ত গ্রামীণ এলাকায় প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ	”	—	—	৯,০৩৯	৬,০২,৩৫৯
২.	বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মাণ	”	—	—	—	৬,১৭৩
৩.	বালোয়াড়ি ও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে শৌচাগার নির্মাণ	”	—	—	—	৬,৬৫৪
৪.	শৌচাগার কমপ্লেক্স	”	—	—	—	২৪৯
৫.	নির্মল গ্রাম পুরস্কার	”	—	—	—	১১২

সমাজের দুর্বলতর অংশের কল্যাণ

উপজাতি কল্যাণ

রাজ্যের উপজাতি জনগণের শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ নিম্নরূপ।

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানে সংরক্ষণ**

  সরকারী চাকুরিতে পদোন্নতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের জন্য ৩১ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে । এটা বিশেষ করে উল্লেখ করার মতো বিষয় যে, রাজ্যে সরকার উপজাতি প্রার্থীদের নিয়োগ, চাকুরী ও প্রমোশনের ক্ষেত্রে অধিকারকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গুরুত্ব দিয়েছেন।

- **বাজেটে অর্থসংস্থান চিহ্নিতকরণ**
  প্রতিটি দপ্তর ট্রাইবেল সাব-প্ল্যান এলাকায় উন্নতির জন্য তাদের নিজস্ব বাজেটে ন্যূনতম ৩১ শতাংশ উন্নয়ন খাতে ব্যয় করেন। ২০১১-১২ অর্থবছরে ট্রাইবেল সাব-প্ল্যান এলাকায় (টি এস পি) প্রায় ৪১.১৬ শতাংশ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

- **ত্রিপুরায় উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন**
  উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার সার্বিক উন্নয়নে গতিশীলতার জন্যে ১৯৮২ সালে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। সংবিধানের সপ্তম তফসিল অনুযায়ী প্রথমে এটি গঠন করা হলেও পরবর্তী সময়ে ১৯৮৫ সালে টি টি এ এ ডি সি-কে ষষ্ঠ তফসিলের আওতাভুক্ত করা হয়। রাজ্য সরকার প্রদত্ত আইনের ক্ষমতার মধ্যে থেকে টি টি এ এ ডি সি-কে ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতা দায়িত্ব ও সম্পদ হস্তান্তর করছে যাতে তারা তাদের দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করতে পারে।

- **শিক্ষা**
  উপজাতিদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে একগুচ্ছ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মেধাবৃত্তি প্রদান, স্টাইপেন্ড, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, কোচিং সেন্টার চালু, বিদ্যালয় স্থাপন এবং একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় চালুর মাধ্যমে গুণগত এবং মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে।

- **অর্থনৈতিক উন্নয়ন**
  কৃষি, উদ্যান ও বাগিচা, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, বন ও শিল্প দপ্তর উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে টি এস পি ফান্ডের ৩১ শতাংশ বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয় করছে। ত্রিপুরা তফশিলী উপজাতি উন্নয়নে ব্যয় করছেন। ত্রিপুরা তফশিলী উপজাতি উন্নয়ন নিগম উপজাতি পরিবারকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্ব-নির্ভর করে তুলতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করছে।

- **উপজাতি সংস্কৃতি**
  ২০০৯ সালে ত্রিপুরা স্টেট একাডেমী অব্ ট্রাইবেল কালচার (টি এস ও টি সি) স্থাপন করা হয় উপজাতিদের নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নতি ও বিকাশের লক্ষ্যে। এই একাডেমীটি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত। অপরদিকে ১৯টি উপজাতি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির উন্নতি ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে ত্রিপুরা স্টেট ট্রাইবেল মিউজিয়াম গঠন করা হয়। ১৯টি জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে।

সম্প্রতি রাজ্যসরকার ককবরক এবং সংখ্যালঘু ভাষাগুলির জন্য একটি পৃথক অধিকার স্থাপন করেছেন। রাজ্যে উপজাতিদের কল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তার একটি রূপরেখা নিচের টেবিলে তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক নং	বিষয়	একক ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
১.	প্রি-মেট্রিক স্কলারশীপ	”	১,৪০২	৩,৪২১	২,৮৮,৪০৮	৯,৯৯,৯৮৬
২.	পোস্ট মেট্রিক স্কলারশীপ	”	১৮৪	২,৯১৯	১২,০৮৪	১,১৯,৬৯৩
৩.	পোস্ট মেট্রিক স্কলারপশীপ (এডিটিভ)	”	০০	০০	৭,৭৩৬	৫৩,৬২৭

৪.	মেধাবৃত্তি	”	০	০	৬,৮২৫	৩৮,০৪২
৫.	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ কোচিং	”	০	০	৪,৭৪৩	২৮,৮০৩
৬.	বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড	”	৬,৬২০	২,২০২	৩৫,৪৪২	১,৭০,৩৬১
৭.	পাঠ্যপুস্তক প্রদান	”	০	০	১,৭২,৬৯৭	১২,৬১,৬৮৭
৮.	মাধ্যমিক ড্রপ আউট ছাত্রছাত্রীদের কোচিং	”	০	০	২৫৩	২৪,৫৫৯
৯.	বহির্রাজ্যে ছাত্রছাত্রীদের স্পনসর	”	০	০	৩২৮	৫৭০
১০.	আই টি আই/জি এন এমও এম পি ডব্লিউ প্রশিক্ষণার্থীদের স্টাইপেন্ড প্রদান	”	০	০	৮১৪	৩,৬১৭
১১.	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	”	০	০	৮০০	২,০০০
১২.	ছাত্রাবাস নির্মাণ	”	০	০	২৪	৯৮
১৩.	ছাত্রীবাস নির্মাণ	”	০	০	১০	৪৪
১৪.	কলেজ হোস্টেল নির্মাণ	”	০	০	০	৫
১৫.	ই এম আর/আশ্রম/ আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণ	”	০	০	০	৮

তফসিলী উপজাতি এবং অন্যান্য চিরাচরিত বনবাসী অধিকার আইন, ২০০৬-এর রূপায়ণ

উপজাতিদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে উপজাতি ও অন্যান্য বনকেন্দ্রিক। আদিবাসীদের জন্য ২০০৬-এর বনাধিকার আইনের রূপায়ণ। প্রকৃতপক্ষে দেশের মধ্যে যেসব রাজ্য এই আইন যথাযথভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ত্রিপুরা তার মধ্যে একটি। এখন পর্যন্ত ১,২০,০৬২ জন বনে বসবাসকারী নাগরিকদের ১,৬৮,৮৩৯.৬১ হেক্টর বন এলাকায় ভোগের অধিকার দেওয়া হয়েছে (যা রাজ্যের মোট ভৌগোলিক আয়তনের ১৬.১ শতাংশ)।

পাট্টা পাশবুক প্রদান এবং পাট্টা প্রাপকদের জন্য জি পি এস ব্যবহার করে জমির চিহ্নিতকরণও করা হয়েছে।

নীচে সামগ্রিক কার্যকলাপের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে :

বিবরণ	উপজাতি জনগণ	অন্যান্য চিরাচরিত বন কেন্দ্রিক বসবাসকারী	মোট
এখন পর্যন্ত যাদের বন আইনের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।	১,২০,০৬০	০২	১,২০,০৬২
ভূমির পরিমাণ (হেক্টর অনুযায়ী)	১,৬৮,৮৩৯.১৩	০.৪৮	১৬৮,৮৩৯.৬১
পাট্টা পাশবুক প্রদান	১,১৯, ৩৮০	০২	১,১৯,৩৮২
ভূমি/জমির চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে (সংখ্যায়)	১,১১,৭০৩	০২	১,১১,৭০৫

এম জি রেগা (এম জি এন আর ই জি এ) এবং অন্যান্য প্রকল্পে প্রাপ্ত অর্থকে কাজে লাগিয়ে উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারদের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পে ৩০শে জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ৪৭,৭৫১ টি পরিবারকে এর সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি মূলত রূপায়িত হচ্ছে, কৃষি, উদ্যান ও বাগিচা, বাঁশচাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্যচাষ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প এবং রেশম চাষের ক্ষেত্রে।

তফশিলী জাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ও বি সি) কল্যাণ

তফশিলী জাতি (এস সি) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের কল্যাণে ও সামগ্রিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ১৯৯২ সালে 'ডিপার্টমেন্ট ফর ওয়েলফেয়ার অব এস সি' নামে নতুন একটি দপ্তর খোলা হয়েছে, যার উপর পরবর্তীকালে ও বি সি সম্প্রদায়ের কল্যাণের দায়িত্বও দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার এস সি এবং ওবিসি জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছেন।

- **তফশিলী জাতি (এস সি)**

  তফশিলী জাতির কল্যাণে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদক্ষেপ নিম্নরূপ

- **নিয়োগ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ**

  সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ ও পদোন্নতির পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রেও তফশিলী জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করা হচ্ছে। এটা উল্লেখের বিষয় যে, রাজ্য সরকারের নিয়োগ, পদোন্নতি ও ভর্তির প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণ পদ্ধতি সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত নিশ্চিত করা হচ্ছে।

- **বাজেটে অর্থসংস্থান**

  এস সি এস পি প্রকল্পে তফশিলী জাতি সম্প্রদায়ের কল্যাণে প্রতিটি দপ্তর ন্যূনতম ১৭ শতাংশ অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করবে, যা বাজেট বরাদ্দের মধ্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই এস সি এস পি প্রকল্পে, মোট ব্যয় প্রায় ১৭.২৩ শতাংশ।

- **শিক্ষা**

  তফশিলী জাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে এস সি জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৪.০৭ শতাংশ, যা রাজ্যের সার্বিক সাক্ষরতার হার ৭২.৩০ শতাংশের চেয়ে বেশি। ২০১১-এর জনগণনার তথ্য এখনো জানা যায়নি তফশিলী জাতির ছাত্রছাত্রীদের থাকার সমস্যার সমাধানে সারা রাজ্যেই শুধুমাত্র এস সি ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ৩২টি ছাত্রাবাস/ছাত্রী নিবাস গড়ে তোলা হয়েছে। অতিরিক্ত আরো ২০টি হোস্টেলে তফশিলী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একসাথে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এস সি ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় স্টাইপেন্ড/স্কলারশীপ প্রদান করা হচ্ছে। রাজ্যের বাইরে জি এন এম/ডি ফার্ম কোর্সে পঠন পাঠনের জন্য তফশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের স্পনসর করা হচ্ছে।

- **অর্থনৈতিক উন্নয়ন**

  তফশিলী জাতিদের উন্নতিকল্পে কৃষি, শিল্প, মৎস্য, উদ্যান ও বাগিচা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ প্রভৃতি দপ্তর এস সি এস পি ফান্ডের ১৭ শতাংশ চিহ্নিতকৃত অর্থে বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ করছেন। ত্রিপুরা তফশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লি. তফশিলী জাতিভুক্ত পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করছে।

  রাজ্যে তফশিলীভুক্ত জাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য নেই।

  কায়িক শ্রমের মাধ্যমে জমাদারের কাজ করার প্রথা বহু আগেই বিলুপ্ত হয়েছে।

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (ওবিসি)

ওবিসি ভুক্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকেও রাজ্যসরকার বিশেষ নজর দিচ্ছেন। এদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষাগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্টাইপেন্ড/স্কলারশীপ প্রদান করা হচ্ছে। রাজ্যের বাইরে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের জি এন এম এবং ডি ফার্ম কোর্সের মতো কর্মমুখী কোর্সে পাঠানো হচ্ছে।

সংবিধান সংশোধন করে যাতে সংরক্ষণের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশকে মুক্ত করা যায় তার জন্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা এবং চাকুরীতে সংরক্ষণের জন্য আর্জি জানানো হয়েছে।

নীচের টেবিলে এস সি ও ওবিসি কল্যাণের অগ্রগতির কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে :

ক্রমিক নং	বিষয়	একক	বৎসর			
			১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২
ক.	**তফশিলীভুক্ত**					
১.	প্রি-মেট্রিক স্কলারশীপ (১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী)	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	—	—	৪,১০০	৪,৮৮৫
২.	তফশিলী ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড (৬ষ্ঠ -১০ম শ্রেণী)	”	—	—	৭১৭	৮৭৭
৩.	তফশিলীভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রি-মেট্রিক স্কলারশীপ (৬ষ্ঠ -১০ম শ্রেণী)	”	—	—	১৪,৫৬৪	৭৭,২৮৯
৪.	ড. বি. আর. আম্বেদর মেমোরিয়াল পুরস্কার (৬ষ্ঠ -৯ম শ্রেণী, মাধ্যমিক ও দ্বাদশ স্তর)	”	—	—	৭৮৬	২২৮৪
৫.	তফশিলীভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পোস্ট মেট্রিক স্কলারশীপ (একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়)	”	—	—	৭,৩৯০	২৮,৬৮৩
৬.	বহির্রাজ্যে জি এন এম/ডি ফার্ম কোর্সে স্পনসর ছাত্রছাত্রী	”	—	—	০	৪৯৭
৭.	তফশিলী জাতি বালক ও বালিকাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ	”	—	—	২৪	৩২
খ)	**অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (ও বি সি)**					
১.	প্রি-মেট্রিক স্কলারশীপ (৬ষ্ঠ -১০ম শ্রেণী)	”	—	—	২,৫০০	৬৫,৬৮১
২.	পোস্ট মেট্রিক স্কলারশীপ (নবম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়	”	—	—	৩,০০০	২৩,৬৯৩
৩.	ড. বি. আর. আম্বেদকর মেমোরিয়াল পুরস্কার (মাধ্যমিক এবং দ্বাদশ স্তর)	”	—	—	২৪৬	৮৩২
৪.	ওবিসি ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস নির্মাণ	”	—	—	০	২
৫.	বহির্রাজ্যে জি এন এম/ডি ফার্ম কোর্সে ছাত্রছাত্রীদের স্পনসর	”	—	—	০	৭৩

* এস সি / এস টি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আরো অতিরিক্ত ২০টি যৌথ হোস্টেল রয়েছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কল্যাণ

রাজ্যে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কল্যাণে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী রাজ্যে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যার হার মোট জনসংখ্যার ১৪.৪ শতাংশ। রাজ্য সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

- **প্রশাসনিক কাঠামো** - ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের উন্নয়নে ১৯৯৯ সালে একটি পৃথক অধিকার (ডাইরেক্টরেট) গঠন করা হয়। সম্প্রতি এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ দপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি রক্ষা, পরিচালনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে ত্রিপুরা ওয়াকফ্ বোর্ড গঠিত হয়। ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মে সংখ্যালঘুদের সহায়তা করতে ১৯৯৭ সালে পৃথকভাবে ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগম গঠন করা হয়। পাশাপাশি, রাজ্যের সংখ্যালঘু জনগণের উন্নয়নে রাজ্য সরকার রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছে। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর রাজ্য বিধানসভায় দ্য মাইনোরিটি কমিশন বিল গৃহীত হয়। উক্ত বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে। বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের অপেক্ষায় রয়েছে।

- **সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামসমূহের জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা** - রাজ্য সরকার ৩০ শতাংশ বা তার বেশী সংখ্যালঘু অংশের মানুষের বসবাস রয়েছে এমন ৭২টি গ্রামীণ এলাকার জনগণের সামগ্রিক উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে ২০০৮-০৯ বৎসর হতে এক বিশেষ কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণ করে আসছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে সড়ক নির্মাণ, বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ, পানীয় জল সরবরাহ, সেচ, আবাসন, বাজার, কমিউনিটি হল, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বালিকাদের হোস্টেল নির্মাণ এবং বিভিন্ন প্রকল্পে সংখ্যালঘুদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রতি সরকার এই কর্মপরিকল্পনার পরিধিকে আরো সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে বর্তমানে ১২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত / ভিলেজ এবং আগরতলা পুরপরিষদের ২৭টি ওয়ার্ড / নগর পঞ্চায়েত যেখানে সংখ্যালঘু অংশের লোকসংখ্যা ২০ শতাংশ বা তার বেশী, তাদের এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

- **শিক্ষা (মাদ্রাসা শিক্ষাসহ)** - রাজ্যের সংখ্যালঘু অংশের জনগণের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিবিধ প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। এইসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে প্রাক্-মাধ্যমিক/ মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষা অনুদান, সংখ্যালঘু বালিকাদের জন্য বিশেষ সহায়তা, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্মৃতি পুরস্কার, নার্সিং, ডি ফার্ম ইত্যাদি কর্মসংস্থানমুখী কোর্সে ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যের বাইরে পড়াশুনার সুযোগ প্রদান করা, প্রাক্-পরীক্ষা কোচিং এর ব্যবস্থা ইত্যাদি। সংখ্যালঘু বালিকাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও উন্নীতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১২৯টি

মাদ্রাসা স্কুলে উন্নত শিক্ষাপ্রদানের কর্মসূচি (এস পি কিউ ই এম) চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় স্কুলে আধুনিক বিষয় যেমন — বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইংরেজী, জীবন বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি পড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর হতে ৫১টি মাদ্রাসা স্কুলকে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে এবং এই সকল মাদ্রাসা স্কুলগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে মাদ্রাসাগুলির উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আওতাধীন সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি পৃথক উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

- **অর্থনৈতিক উন্নয়ন** - ভূমিহীন কৃষক / অকৃষক শ্রমিকদের পুনর্বাসন প্রকল্পের (সেটেলম্যান্ট স্কীম) আওতায় পরিবার পিছু ৫০,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। অনুরূপ ভাবে, সংখ্যালঘু গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থনৈতিক কাজকর্ম রূপায়ণের জন্য প্রতি পরিবারকে ১০,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। সংখ্যালঘু জনগণের জন্য আই এ ওয়াই প্রকল্পে ঘর তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। জনসংখ্যায় তাদের অনুপাত অনুসারে এই প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। নিউক্লিয়াস বাজেট স্কীম হতে সংখ্যালঘু অংশের রোগীদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সংখ্যালঘু শ্রেণীর জনগণ, বিশেষ করে মহিলাদের নিয়ে স্ব-সহায়ক দল গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাজকর্ম রূপায়ণ করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সংখ্যালঘু নিগম হতে ঋণ দানের মাধ্যমে আর্থিক কাজকর্ম রূপায়ণে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই নিগম হতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাখাতে ঋণ দান ও বিবিধ বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সংখ্যালঘু কল্যাণে অগ্রগতির চিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	বিষয়	একক	১৯৭২/৭৮	১৯৯৪	২০০৮	২০১২
১.	প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ	ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	-	১,৪৩০	১০,৬১৪	২৪,৩৮৩
২.	পোস্ট-মেট্রিক স্কলারশিপ	ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	-	৯৪২	১,২০৭	২,২৬৩
৩.	সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিক স্কুল (বোর্ডিং হাউস)	ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	-	-	০	২৫৬
৪.	মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্মৃতি পুরস্কার	ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	-	-	২৯	১১৬
৫.	সংখ্যালঘু ছাত্রীদের নার্সিং ট্রেনিং	ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	-	-	৮	১০৫
৬.	ছাত্রদের জন্য ডি-ফার্মা কোর্স	ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	-	-	০	১১
৭.	সংখ্যালঘু বালিকাদের জন্য বিশেষ সহায়তা	ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	-	-	২১৭	৭১০
৮.	সংখ্যালঘুদের জন্য সেটেলম্যান্ট স্কীম	পরিবার সংখ্যা	-	-	৭	৩০

অগ্রগতির দিশা

যদিও সকল ক্ষেত্রেই রাজ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও এখনো আরো অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে হবে। তাই আত্মতুষ্টির এখন কোনো অবকাশ নেই। রাজ্যের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতাকে পাথেয় করে সমগ্র দেশের মধ্যে এক আদর্শ রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরাকে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। আগামী দিনগুলিতে যেসব ক্ষেত্রের প্রতি সরকারের বিশেষ নজর থাকবে সেগুলি হল ঃ

- সড়কপথ, রেলপথ ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার আরো উন্নতিসাধন। পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতিসাধন।
- ১০০ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জন এবং প্রাক্ -প্রাথমিক, বিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষা, কারিগরিবিদ্যা, এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ প্রদান।
- রাজ্যের সকল জনগণের জন্য মৌলিক সুযোগ সুবিধা যেমন— আবাসন, পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যবিধি এবং বৈদ্যুতিক পরিষেবার বন্দোবস্ত করা।
- রাজ্যের সকল মানুষের জন্য উত্তম মানের ও উপযোগী স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদান করা।
- রাজ্যের প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে জাতীয় গড়ের চেয়ে দ্রুত হারে ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় গড়ের চেয়ে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন করা।
- সুষ্ঠু ও সামাজিক সমতার সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।
- সর্বোপরি, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে যুব সমাজের কর্মশক্তি ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের উন্নতি সাধন করা।

উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১২ সালে নবগঠিত সমস্ত প্রশাসনিক কাঠামোকে কার্যকরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা এবং ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত ও স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সম্মিলিত অংশগ্রহণের ফলে আশা করা যায় এ রাজ্য শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলবে।

Printed by : Jhan Bichitra Press, Agartala, Phone : 232 3781 / 232 6342 / 094365 86254